মজদুর

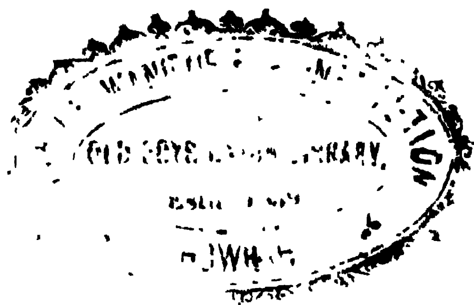
বিশ্ব বিশ্বাস

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

দেড় টাকা]

প্রকাশক :—
ব্রজবিহারী বর্ম্মণ
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
৭২, হ্যারিসন্ রোড্,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ
পপুলার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৪৭, মধুরায় লেন, কলিকাতা



বিভুতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়

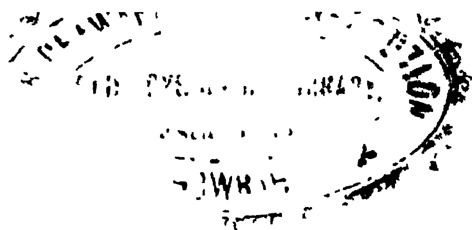
প্রীতিভাজনেষু—

উপন্যাসখানি ১৯৩৯ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৪০ সনের জুন পর্যন্ত মাসিক ‘অগ্রণী’তে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

এই লেখকের লেখা উপন্যাস

—মরূদ্যান—

‘Hunger is deeper than Sex’



মজদুর

এক

কারখানার বাঁশি প্রভাতের আব্ছা অন্ধকারে বাজিয়া উঠিয়া সারা শহরটাকে সচকিত কবিয়া তোলে……

ঝন্ ঝন্ শব্দে কল-বাড়ীর গেটগুলো খুলিয়া যায়। গুন্তি করিয়া সরদার কুলিদের ছাড়ে………

এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছ', সাত—সাতের পব যে কুলিটা প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, সরদাব দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া গালে এক থাপড় মারিয়া বসে। গেটের সাম্নে সে পড়িয়া যায়।

পিছনে যে সব কুলিরা পর পর দাঁড়াইয়াছিল, মাসানের উপর সরদারের এ হঠাৎ ক্রোধে যেমন তাহারা হয় সন্ত্রস্ত, তেমন হয় অবাক।

সরদারের মারের আর বিরাম নেই। ভূপতিত মাসানের পেটে এক লাথি মারিয়া সরদার মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠে: শালা, কাল না তোর জবাব হ'ল, আবার এখানে মরতে কেন?

প্রহরী মাসানকে টানিতে টানিতে গেটের বাহিরে লইয়া যায়। হতভম্ব মজুরের দল নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়াইয়া মাসানের উপর অত্যাচার দেখে।

সরদারের তর্জনে তাহারা চমকিত হয়। একটা ধাক্কায় আট নম্বরকে গেটের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া সরদার চিৎকার করিয়া উঠে: চা-লা-ও।

আবার গুন্‌তি সুরু হয়।

নয়, দশ, এগার, বার, তের, চৌদ্দ······

*   *   *   *

কলের কাজ হয় সুরু।

চাকার পর চাকা অফুরন্ত অবিশ্রান্ত গতিতে ঘুরিয়া চলে। কলের ঘর্ঘর শব্দের সাথে মিলিয়া যায় মানুষের নিশ্বাস। বিরাট অবরুদ্ধ কারখানার মাঝে অনবরত চলে কল আর মানুষ- -মানুষ আর কল। বুটপায় প্রহরী ঘুরিয়া বেড়ায়, ফোরম্যানের হাতের ছড়ির শন্‌ শন্‌ শব্দ শোনা যায় আর তার সংগে সারা কল-ঘরটাকে প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হয় সরদারের গর্জন।

মুহূর্তের পর মুহূর্ত যন্ত্র-দানবের সংগে হয় অগণিত মজুরের পরিচয়!

গেটের প্রহরী পর পর নয়টা ঢং ঢং শব্দ করিয়া বেলা নয়টা বাজিল জানায়···সরদার হেড্‌ ফোরম্যানের ঘরে মাসানকে ধরিয়া আনে।

ফোরম্যান মাসানকে দেখিয়া ক্ষেপিয়া যায়—হাতের চাবুকটা শপাৎ শপাৎ তাহার পিঠের উপর বসায়।

মাসান কাঁদিয়া ফেলে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলেঃ লেড়কীর বড় বুখার হ'য়েছিল, সাহেব। টিফিনে ঘরে গিয়ে দেখি শরীর তার পুড়ে যাচ্ছে। বাবা, বাবা, ব'লে কাঁদ্‌তে লাগল, ছেড়ে তাড়াতাড়ি আস্‌তে পারিনি!

সাহেব বলেঃ ও কথা আমরা শুন্‌তে চাই না—তোমার বরখাস্ত হ'য়ে গেছে। ভাগ্‌ হিয়াসে।

সাহেবের ঘরের বাহিরে আসিয়া মাসানকে সরদার ব্যঙ্গ করিয়া বলেঃ কীরে শালা, সাহেব ক'রল না বহাল।

একটা ধাক্কায় সরদার মাসানকে গেটের বাহির করিয়া দেয়।

* * * *

মাসান বাহির হইল উন্মুক্ত রাস্তায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব-কিছু যেন তাহার চোখের সাম্‌নে ঘুরিয়া উঠিল। হপ্তার মাইনে হপ্তায় শেষ হইয়া যায়, ঘরে আর বাড়তি দানা থাকে না। কি করিয়া যে এতগুলি প্রাণীর আহার জুটিবে সে ভাবনা তাহাকে অধীর করিয়া তোলে। তাহার পর তাহার আদরের একটা মেয়ে রোগশয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সে যখন তাহার কাছে এটা-সেটার বায়না ধরিবে, তখন দুধের শিশুকে শান্ত করিবার কোন ভাষাই যে তাহার থাকিবে না, একথা ভাবিতেই মাসানের চোখে জল আসিয়া পড়ে।

কলের বস্তি! লাইন-বন্দী সব ঘর, মাঝখান দিয়া যাতায়াতের রাস্তা। সন্ধ্যাবেলা এইখানেই খাটিয়া পাতিয়া

মজুরের দল মদ খায় আর হল্লা করে। কিন্তু এখন সমস্ত বস্তিখানা একটা নিঝুম্ নিস্তব্ধতায় ভরা। মেয়েপুরুষ যে-যাহার কাজে চলিয়া গিয়াছে, তুই একজন মেয়ে কিংবা ছোট ছেলে যাহারা কাছে যায় না তাহারা এখন তুপুরের নিরব অবসরে বিশ্রাম করিতেছে আর সারা বস্তির বাসিন্দারা এখন কারখানায় অনবরত ঘূর্ণায়মান যন্ত্রের সাথে মিশিয়া গিয়াছে।

বস্তির একটা কুঠরীতে তখন একটী স্ত্রীলোক কেবল বিশ্রাম করিবার অবসর পায় নাই। সে মাসানের বৌ! মেয়েটীর জ্বরটা অসম্ভব রকম বাড়িয়া গিয়াছে, গরমে গা একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে, চোখমুখ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। নিরব নিশ্চল পাথরের মত সে তাহার শিয়রে বসিয়া জলপটি দেয় আর হাওয়া করে।

কিছুক্ষণ পর মাসান এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বাসায় ফেরে কিন্তু মেয়ের অবস্থা দেখিয়া মুখ দিয়া তাহার আর রা বাহির হয় না। বৌর কাছে গিয়া বলে: হামিদা, সাহেব বহাল ক'রল না।

হামিদার চোখ দিয়া জল ঝড়িয়া পড়ে। রুদ্ধকান্নার আবেগে বলিয়া উঠে: বহাল ক'রল না!

মাসান উত্তর দেয়: না।

হামিদা বলে: তবে কী চুপ ক'রে থাক্‌বি? নোকরি দেখ্‌বি না? আমরা না নয় না-ই খেলাম, কিন্তু লেড়কী যে মরবে।

মাসান কাঁদিয়া ফেলে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে: আমি কী করব বল, হামিদা! সাহেবের হাত পায় ধরলুম, কিন্তু করল না বহাল।

একটু থামিয়া আবার বলে: স্‌টেশনের কাছে নাকি নূতন একটা কল খুল্‌ছে, লোকও নাকি দু'একজন বহাল হচ্ছে—দেখি কাল একবার।

হামিদা বলে: দেখ্‌ দেখ্‌—লেড়কীর মুখে দানাপানি দিতে না পারলে ও মরে যাবে। আমাদের জান্‌ তাহ'লে বাঁচবে না, মাসান।

মাসানের চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়ে আরেক ফোঁটা জল!

* * * *

দিবসের বিদায় দিতে গোধূলির অন্ধকার সারা দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে।

রাস্তায় রাস্তায় ক্লান্ত মজুরের দল হল্লা করিয়া বস্তির পানে চলে। প্রভাতের আকাশে কখন সূর্য লাল রঙে আকাশ ছাইয়া উঠিল, সারা দিনটী নিজের কিরণে পৃথিবীকে মণ্ডিত করিয়া কখন যে বিদায় নিয়া চলিয়াছে এর এতটুকু সংবাদ গিয়া পৌঁছায়নি সেই অবরুদ্ধ কারাপ্রাচীরের অন্তরালের অগণিত মজুরের কাছে যেখানে তাহারা সারা দিবসটা শোনে লৌহযন্ত্রের বিকট কান্না আর কারখানার করুণ আর্তনাদ।

ক্ষিণ্ণ অবসন্ন কুলির দল, দলে দলে তাহাদের কুঠরীতে ফিরিতেছে।···ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শ্রমিক,—মুখে চোখে দেহে

পরিশ্রমের গ্লানি। যন্ত্র-দানবের ক্ষুধার পায়ে দেহের শক্তিকে ক্ষয় করিয়া ফিরিয়া আসে তাহারা—পুঞ্জীভূত ব্যর্থতাই শুধু মাত্র সম্বল।

নিরব বস্তিগুলো আবার কোলাহলে ভরিয়া উঠিল। ছোট্ট ছোট্ট কুঠরীতে আবার বাতি জ্বলিল। গিন্নীরা দাওয়ায় উনুন ধরাইয়া রান্না করিতে বসিল। ছোট ছেলেমেয়েরা বড়দের হুকুম খাটিতে খাটিতে হায়রান হইয়া উঠিল। মজুররা রাস্তায় বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম লয়······

চারিদিকেই একটা বিরাট গুঞ্জন সুরু হয় কিন্তু এ আনন্দের উচ্ছ্বাস নয়, অবসন্নতার প্রলাপ।

মাসানের ঘরের দিকে কান্নার শব্দ শোনা যায়। উন্মত্ত মজুরের দল ছুটিয়া যায় মাসানের ঘরে। মেঝের একটা ছেঁড়া মাতুরে মাসানের মেয়েটা শুইয়া আছে আর অতিরিক্ত জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকে। হামিদা শিয়রে বসিয়া কাঁদে।

বস্তির লোকদের দেখিয়া মাসান একেবারে তাহাদের কাছে ছুটিয়া যায়।

কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠেঃ ভাইরে লেড়কী আমার বাঁচলো না।

ভিড়ের মধ্য থেকে বাবুলাল আগাইয়া আসিয়া বলেঃ কি হ'ল রে মাসান!

মাসান বলেঃ বুখার, ভাই. বুখার। আজ তিন রোজ তার

বুখার। মুখে আজ ওর দানাপানি দিতে পারিনি। দোকানী আর সওদা বাকি দেবে না ভাই!

রোশেনালী চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠেঃ কোন্ শালা দোকানীরে, বাকি দিতে চায় না, মাসান চাচা!

মাসান উত্তর দেয়ঃ কিন্তু তার আর কি দোষ দেব, রোশেন! আমারই নসিব খারাপ। সাহেব আমায় বরখাস্ত করেছে, তাই দোকানী বল্‌ছে, তোর নোকরি থাক্‌ল না, কিসের ভরসায় বাকি ফেল্‌ব।

সবাই একেবারে সমস্বরে বলিয়া উঠিলঃ বরখাস্ত—একদম বরখাস্ত!

বাবুলাল বলিয়া উঠিলঃ ঐ একটু লেটের জন্য একেবারে বরখাস্ত ক'রল।

মাসান উত্তর দেয়ঃ সাহেবের কত হাত পায় পড়লুম, শুনল না বাবুলাল। সরদার আর সাহেবের মার খেয়ে জানটাই কাবু হ'ল।

ভিড়ের মধ্য থেকে বিহারী আগাইয়া আসিল। বাঙালী নমশূদ্র জাতিতে সে। বিশাল শাল গাছের মত তাহার দেহ। পাথরের মত নিকষ কালো তাহার দেহের রং। সে বলিয়া উঠিলঃ বাবুলাল, ঐ শালা সরদার—ও আমাদের দুশমন! দুনিয়ার শয়তান, শালা!

হরলাল আর একজন বাঙালী মজুর। সে বিহারীকে

তাড়া দিয়া বলিল ঃ চুপ কর, বেহারী। এখন মাসানের কি করা যায় তাই দেখা যাক্।

হরলালের কথা শুনিয়া রোশেনালী বলিয়া উঠিল ঃ তোমার লেড়কীর বুখার দুদিনে ভাল হ'য়ে যাবে, মাসান চাচা! দিলদারের বুড়ী মাকে একবার নিয়ে এস, খুব তুক্-তাক্ জানে। লেড়কা-লেড়কীর বুখারে বুড়ীর হাত খুব ভাল।

বাবুলাল রোশেনালীর কথায় ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলে ঃ তাই কর্, মাসান, তোর লেড়কী ভাল হ'য়ে যাবে। সওদা না হয় ক'টা দিন আমাদের হিসাব থেকে নিয়ে আস্‌বি। তুই আর ভাবনা করিস্‌নি, বৌকে কাঁদ্‌তে মানা কর্, লেড়কী ভালো হ'য়ে যাবে।

বস্তির লোকজনের সান্ত্বনায় মাসান বিশেষ করিয়া হামিদা অনেকটা আশ্বস্ত হয়। মজুরের দল আবার ফিরিয়া যায় নিজেদের কুঠরীর পানে।

* * * *

সারা দিনের কাজে পরিশ্রান্ত অবসন্ন বস্তির মেয়েপুরুষদের চোখে কখন যে ঘুম আসিয়া পড়ে, তাহারা নিজেরাই হয়ত তাহা বুঝিতে পারে না। অনবরত কর্মকোলাহলময় কলের এলাকা রজনীর আবির্ভাবে বিরাট নিস্তব্ধতায় ভরিয়া যায়, সুপ্তির শান্তিময় নীড়ে অগণিত মানুষ পায় বিশ্রামের অবসর।

মধ্যরজনীর এ নিস্তব্ধতার মাঝখানে দূরে কলের সাহেবদের কুঠি হইতে পিয়ানোর সুর ও নরনারীর নৃত্যের কলরব ভাসিয়া আসে, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর শব্দ হয়ত পৌঁছায় না এই অগণিত ঘুমন্ত মজুরদের কানে। পরিশ্রান্ত শ্রমিকের দল যে-যেখানে পাইয়াছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ক্ষণিকের জন্য যেখানে জাগে না কর্মের কোলাহল আর যন্ত্রের আর্তনাদ।

দুই

স্টেশনের ধারে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর পড়িয়া ছিল তার সবখানি জুড়িয়া এক বিরাট কাপড়ের কল তৈয়ারি হইয়াছে।

কোটিপতি বণিকদের মূলধনে এই জংলা জলা জায়গাটুকু পরিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে, মানুষের পদার্পণ যেখানে একদিন অসম্ভব ছিল, সেখানে গড়িয়া উঠিয়াছে এক বিরাট কারখানা যার এলাকায় তৈয়ারি হইতে সুরু করিয়াছে মালিকদের সুরম্য বাসস্থান, প্রমোদোদ্যান আর তারই সাথে রাস্তা, বস্তি-, বাজার।

দলে দলে শ্রমিক কাজে লাগিয়াছে। মজুররা মাটি খুঁড়িয়া মাটি তোলে আর মেয়ে মুটেরা মাটি ঢালিয়া রাস্তা বাঁধে। মিস্ত্রীরা মই-এ চড়িয়া ইট গাঁথে, শিশু-মজুররা সুরকি, চুন, বালি বহিয়া বেড়ায়। ওভারসিয়াররা মাঠের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়া কাজ তদারক করে, আর কারখানার সমুদয় অঞ্চল প্রকম্পিত করিয়া উঠে মাঝে মাঝে সরদারদের তর্জন।...

বড় মাঠটার ভিতর এক-এক বিভাগের এক-এক সরদার আপিস্ খুলিয়া মজুরদের পরীক্ষা করিয়া কলের কাজে লইতেছে। দিনরাতই অবিশ্রান্ত আসিতেছে কর্মপ্রত্যাশী শ্রমিকের দল, কেহ বা সফলকাম হইয়া, কেহ-বা ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ফিরিতেছে নিজেদের ডেরায়।

বিভাগের সরদারের ঘরে ঢুকিয়া মাসান একটা সেলাম

ঠুকিয়া সামনে দাঁড়াইল। চারিদিক্‌কার নানান্ কাজের মধ্যে মনোযোগটা রাখিয়াই সরদার প্রশ্ন করিল: কি নাম তোমার ?

'আমার নাম মাসান' মাসান উত্তর দিল। সরদার পুনরায় প্রশ্ন করে: কলের কাজ কিছু জানো ?

'হাঁ, জানি, রেগাল জুট মিলে কিছুদিন কাজ করেছি।' মাসান্ উত্তর দেয়।

সরদার প্রশ্ন করে: সার্টিফিকেট আছে ? মাসান উত্তর দেয়: না, তবে বোধ হয় আনা যাবে। সরদার প্রশ্ন করে: ওখানকার নোক্‌রি নিজে ছাড়লে, না, ছাড়িয়ে দিল ?

মাসান বলে: লেড়কীর বুখারের জন্য টিফিনে একদিন একটু লেট হ'য়ে পড়ি, তাই সাহেব বরখাস্ত করল। সার্টি-ফিকেট বোধ হয় দেবে।

সরদার তাহার হাতের কাজটা বন্ধ রাখিয়া মাসানের দিকে চাহিল। চোখমুখ কালো করিয়া বলিয়া উঠিল: ছাই দেবে। আমাদের সায়েব একথা শুন্‌লে তোমার নোক্‌রি মিল্‌বে না, তা আমি বলে দিচ্ছি।

মাসান বেশ চিন্তিত হইয়া পড়িল। অনুনয়ের সুরে বলিল: সার্টিফিকেট না হ'লে কি চলে না, সরদার !

সরদার ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, সে হয় না। ভিন্ন কল হইতে আগত মজুরদের সার্টিফিকেট না দেখিলে কোন কলেই তাহাদের বহাল করা চলিবে না, কলওয়ালাদের মধ্যে

এই রকম একটা সর্ত নাকি হইয়া গিয়াছে। সরদারদের ইহাতে কোন হাত নাই।

সার্টিফিকেটের জোগাড় করিয়া তারপর আসিবে এই কথা জানাইয়া সেলাম ঠুকিয়া মাসান বিদায় লইতেছিল কিন্তু সরদারের আবার ডাক পড়িল।

কলের এই সব সরদার—ইহারা এক-এক জন ভয়ানক জীব। অগণিত শ্রমিকদের পরিচালনার ভার পাইয়া ইহারা একেবারে কসাইয়ের মত নিষ্ঠুর হইয়া পড়ে এবং এতখানি নিষ্ঠুর ও অর্থগৃধ্নু বলিয়াই সাহেবরা ইহাদের উপর কুলিদের পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার ভার দিয়া বেশ নিশ্চিন্ত আরামে থাকিতে পারে। সরদারদের কাজের গুণে মালিকদের সে নিশ্চিন্ততা ভগ্ন হয় না সত্য কিন্তু তাহাদের অধীনস্থ এই সব মজুররা অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে। কারখানার পাঁচিলের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাটিয়া তাহারা যাহা রোজগার করে, তাহারই একটা ভাগ এই সরদারের হয় প্রাপ্য; তাহা ছাড়া প্রতি মুহূর্তে ইহাদের সন্তুষ্ট করিয়া না চলিতে পারিলে মজুরদের বাঁচিয়া থাকা হয় দায়।

সর্বপ্রকারে মালিকদের মনস্তুষ্টি করিয়া প্রভুত্ব লাভ করিতে এবং সুযোগ সুবিধায় শ্রমিকদের শোষণ করিয়া অর্থোপায় করিতে ইহাদের জোড়া আর নাই। অভ্যাসে মজ্জাগত নিষ্ঠুরতাটুকু চাপিয়া রাখিয়া কার্য হাসিল করিতেও ইহারা একেবারে ওস্তাদ।

সরদারের ডাকে মাসান আবার ফিরিতেই সরদার জানাইল যে হয়ত সে সার্টিফিকেট পাইবে না, পাইলেও যে ইহা কোন কাজের হইবে না ইহা সুনিশ্চিত। তবে সে মাসানের জন্য একটা উপায় বাহির করিতে সক্ষম হইবে যদি মাসান এখন রাজি হয়।

মাসান ব্যস্তসমস্ত ভাবে তাহার সম্মতি জানাইতেই সরদার তাহাকে একেবারে পাশে টানিয়া লইয়া গোপনে বলিল: একশ'টা রূপেয়া যদি জোগাড় ক'রতে পারিস, মাসান, কোন হাঙ্গামাই আর থাকবে না।

মাসান যতখানি হতভম্ব হইয়া পড়িল, মানুষ আকাশ থেকে পড়িলেও বোধহয় এতখানি হয় না। হতাশার সাথে সে বলিল: রূপেয়া থাকলে কী আর নোক্‌রির জন্য ঘুরে মর্‌তাম, সরদার। আল্লার কসম, ঘরে আমার একটা দানা বল্‌তেও নেই।

সরদারের ভিতরকার যে স্বভাবগত কঠোরতা এতক্ষণ ধরিয়া চাপা পড়িয়াছিল এখন তাহা আপনা-আপনিই আত্ম-প্রকাশ করিল। রীতিমত ঝাঁজের সংগে সে বলিয়া উঠিল: ঘরে দানা নেই ত এখানে মর্‌তে এসেছিস কেন? সরদারের দস্তুরি দিতে হবে না, অমনি নোকরি মিল্‌বে?

মাসান প্রশ্ন করিল: দস্তুরি—একশো রূপেয়া দস্তুরি!

সরদার বলিল: একশ' না হ'লেও চল্লিশ ত দিবি? আর বিনা সার্টিফিকেটে যে কাজ মিল্‌বে সেটা বুঝি শুধু শুধু!

মাসান বহুক্ষণ ধরিয়া সরদারের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করিল, কিন্তু সরদারের অটল হাঁকও আর নামিবার নয়! অগত্যা মাসান আবার বাহির হইল উন্মুক্ত রাস্তায়।

মাসান কুঠরীতে ফিরিল কিন্তু হামিদা যখন কাতরভাবে অনেকখানি আশা লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল তখন তাহাকে আশ্বাস দিবার ভাষা সে খুঁজিয়া পাইল না। ত্বধের শিশু রোগশয্যায় পড়িয়া ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করে অথচ পিতা হইয়া তাহার মুখে একটা দানা দিবার সামর্থ্যও এখন তাহার নাই।

চোখের উপর দাঁড়াইয়া এ দৃশ্য দেখা তাহার কাছে অসহ্য লাগিল, আবার সে বাহির হইল।

নিরব নিস্তব্ধ ত্বপুর! প্রখর তাপে রাস্তার পিচ গলিয়া গিয়াছে। পথে একটা মানুষও নাই। মাসান একা একা চলে।

মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শুধু জাগিয়া উঠে সমস্ত কারখানার অন্তস্থল হইতে বিরাট ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ!

মাসান কারখানার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। লোহার রেলিঙের উপর মাথাটা রাখিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল এই কারখানার পাঁচিলের মধ্যে বছরের পর বছর খাটিয়া দেহের ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দিয়া আজ তার প্রতিদান মিলিল অনশনের জ্বালা। কলের সাহেবদের টেনিস খেলার মাঠে এরি মধ্যে খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে; ঐ দিকে চাহিয়া

মাসানের কেবলই মনে হইতে লাগিল, রেলিঙের শিকগুলো ধরিয়া একটা ঝাঁকা মারিয়া এই কারখানাকে প্রশ্ন করে : নিষ্ঠুর, তুমি কি এ সব দেখতে পাও না !

ইট, সুরকি, লোহা, কাঠের কারখানা এ, এ প্রশ্ন তাহার কাছে পেঁছাত কিনা কে জানে, যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দের সাথে যেন এরই উত্তর বাহির হইয়া আসিল, নির্মম অট্টহাসি !

মাসানের চিন্তার সূত্র এক মুহূর্তে ছিঁড়িয়া গেল, সরদারের হুমকি প্রতিধ্বনিত হইল একেবারে তাহার কানের কাছে— সেদিনকার সেই সরদার।

রেলিঙের ঠিক ওপাশটায় সরদারের মুখখানা দেখিয়া মাসান কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে আচমকা নিজের ছায়া দেখিলে মানুষ যেমন ভয় পায়।

মাসান নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল : গোস্তাকি মাপ কর, সরদার। তোমার সংগে একটা কাজের জন্য এখানে খাঁড়া আছি।

সরদার ওপাশ হইতে মাসানের চুলের মুঠি ধরিয়া ফেলিল, গলার স্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিয়া উঠিল : কাজের জন্য এসেছিস্ ত সাহেবের কুঠীর কাছে গরাদ ধরে হেঁচকাচ্ছিস্ কেন ? শালা, চুরি না সিঁধ কাটার মতলব।

মাসান যতই তাহার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অস্বীকার করিতে থাকে, সরদার ততই তাহাকে পাইয়া বসে। হাতের মুঠিতে মাথার চুলগুলো ধরিয়া রেলিঙের শিকে মাসানের মাথাটা

তুই একবার ঠুকিয়া দিয়া সরদার বলিয়া উঠেঃ দাঁড়া, চুরি করা তোর বার কচ্ছি!

অনতিদূরে যে প্রহরীটা পাহারায় ছিল, সরদারের ইংগিতে ছুটিয়া আসিল এবং তাহার আদেশে মাসানকে কারখানার মধ্যে ধরিয়া আনিল।

প্রহরীর পাহারায় সরদার মাসানকে সাহেবের কামরায় লইয়া আসিল, বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ চুরি অথবা কোন বদ্ মতলবের চেষ্টা।

মাসান পুন পুন এ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিল যে তাহার বদ মতলব ছিল না, শুধু একখানা সার্টিফিকেটের জন্য সবেমাত্র ওখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু সাহেব এ একেবারেই বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না; কারণ প্রহরীটা বলিয়া উঠিল সে নাকি পাহারায় ঘুরিতে ঘুরিতে বেশ দেখিতে পাইয়াছে মাসান গরাদ ভাঙিয়া সাহেবের কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

কারখানা-বাড়ীর একটী প্রান্তে একটী ছোট কুঠরী। ঘরের ভিতরটা একেবারে অন্ধকার ও অপরিচ্ছন্ন এবং চারিদিকটা এত নির্জন যে ভয় বলিয়া যাহার কোন বস্তু নাই, তাহারও রীতিমত শংকা লাগে। হাত-কড়ি অবস্থায় মাসানকে এই এই ঘরটীতে রাখিয়া তালাবন্ধ করিয়া প্রহরী চলিয়া গেল।

রজনীর কোন কোলাহল এখানে আসিয়া পৌঁছায় না, চারিদিক নিরব নিস্তব্ধতায় ভরা। অন্ধকার নির্জন এই

কুঠরির মধ্যে মাসানের আত্মা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে, চোখের উপর এই জমাট অন্ধকার এত অসহ্য লাগে যে সে চোখ বুঝিয়া দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া থাকে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত রজনী কাটিয়া যায়, মাসানের চোখে ঘুম আসে না। পুঞ্জীভূত চিন্তা আসিয়া তাহার মাথার ভিতর ভিড় করিয়া বসে। হামিদা সারা দিন মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পারে নাই, দুধের শিশু ক্ষুধার জ্বালায় হয়ত কাত্রায় আর মা হইয়া হামিদার শিয়রে বসিয়া শুধু মাত্র চোখের জল ফেলা ছাড়া আর ত কোন উপায়ই নাই। কল্পনার চোখে এ সব দৃশ্য দেখিয়া মাসানের দেহ শিহরিয়া উঠে, চোখে যে ঘুমটুকু আসিয়া পড়িতেছিল তাহা টুটিয়া যায়। অবরুদ্ধ ঘরের মধ্যে বন্দী মাসান চঞ্চল হইয়া উঠে কিন্তু যতই সে চিন্তা করে ততই সে নিজেকে চারিদিক হইতে নিরুপায়ই দেখে।

আজ এই এক রাতের বন্ধন হয় ত শেষ নয়। কত লাঞ্ছনা এর পর তাহার জন্যে সঞ্চিত আছে কে জানে

হয়ত সাহেব তাহাকে পুলিশে চালান দিবে। সাক্ষী-সাবুদের অভাব যে হইবে না এ জানা কথা কিন্তু তার ফলে হয়ত তাহার বিনা দোষে দীর্ঘ দিনের কারাবাস। সংসার পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সে পড়িয়া থাকিবে কারাগারের অন্তরালে আর দুধের শিশুটি অনাহারে এখানে শুকাইয়া মরিবে. চোখের জলে ভিজিয়া ভিজিয়া হামিদা পথের ভিখারিণী হইবে। নিষ্ঠুর নির্মম ভাগ্য সুন্দরভাবে তাহাকে

অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মাসান মনে মনে বলে: চমৎকার!

মুহূর্তের পর মুহূর্ত রজনী চলিয়া যায়, কোথায় কে বিনিদ্র রজনী যাপন করিল—কোথায় কে সুখশয্যায় নিদ্রা গেল এ তার সংবাদ রাখে না। আপনার গতিভংগিতে ইহা চলিয়া যায় মুহূর্তের পর মুহূর্ত!

অন্ধকার ঘরে মেঝের উপর পড়িয়া থাকে মাসান, নিদ্রাহীন চোখের উপর ভাসিয়া উঠে রোগশয্যায় মেয়েটির কাতর মুখখানি ও শিয়রে হামিদার অশ্রুজল। বাহিরে আকাশে তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, গাছের মাথায় মাথায় চাঁদের কিরণ ঢলিয়া পড়িতেছে, মধ্যরজনীর পূর্ণ নিরবতা চারিদিকে নামিয়া আসিয়াছে। মাঝে মাঝে শুধু ঝাউগাছগুলোর পাতায় পাতায় জাগিয়া উঠে সারা কারখানার অন্তস্থলে যে ব্যথা ও বেদনা ভাসে তাহারি বিলাপধ্বনি।

তিন

বারান্দায় বুটপায় প্রহরীর চলার শব্দ……

বাবুলাল আপন মনে চলমান কলের গহ্বরে পাট ঢুকায়। কারখানার এ অংশটায় শুধু অনবরত কল-চলার শব্দ! প্রচণ্ড কলটার সংগে তাল ফেলিয়া কাজ করিতে করিতে বাবুলাল হাঁফাইয়া উঠে।

মাঝে মাঝে মেয়ে-মজুররা আসিয়া সাফ্ পাট বাহিরে লইয়া যায়।

বাবুলাল একা-একা আপন মনে আপনার কাজ করে, রোশেনালী হঠাৎ অতিশয় সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। এ সময় নিজের কাজ ছাড়িয়া রোশেনালীকে এখানে আসিতে দেখায় বাবুলাল রীতিমত বিস্মিত হইয়া পড়ে। হাতের কাজটা করিতে করিতে চুপি-চুপি সে বলে: কি রোশেন, এ সময়! কেউ দেখেনি ত? যে শয়তান এখানকার সরদার। দেখ্‌লে কিন্তু আজ আর রক্ষে নেই।

রোশেনালী গলাটা খাটো করিয়া বলে: না, কেউ দেখেনি, কিন্তু মাসান চাচার খবর শুনেছো?

বাবুলাল উত্তর দেয়: না, কি হয়েছে?

রোশেনালী বলে: মাসান চাচাকে এরা আট্‌কে রেখেছে, —কোনের ঐ ঘরটায়, যেটা আগে আলো-জ্বালার ঘর ছিল।

বাবুলাল আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিল : বলিস্ কিরে? রোশেনালী উত্তর দেয় : বাতি-ঘরের রহমান দেখেছে। শুন্‌ছি, মাসান চাচাকে নাকি পুলিশে চালান দেবে।

একেবারে দরজার কাছে প্রহরীর বুটের শব্দ শোনা যায়। বাবুলাল সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে রোশেনালী কলের আড়ালে গিয়া দাঁড়ায়।

প্রহরীর সাথে আসে মেয়ে-মজুররা, পাটের মোট লইয়া তাহারা চলিয়া যায়।

বাবুলাল প্রশ্ন করে : পুলিশে চালান দেবে কেন রে! রোশেনালী উত্তর দেয় : কাল বিকেলে বড় সাহেবের কুঠিতে সিঁধ কেটে ঢুক্‌তে গিয়ে নাকি ধরা পড়েছে। আমাদের সরদার ত তাই ব'ল্‌ল।

বাবুলাল বলিল : বলিস্ কী, মাসান তো তেমন লোক নয়! অভাবে পড়েও যে আমাদের কাছ থেকে একটা কানাকড়ি পর্যন্ত নিল না, সে ক'রবে চুরি! মিছে কথা, রোশেন, মিছে কথা।

বাবুলালের কথায় সায় দিয়া রোশেনালী বলে : আমরাও তো তাই বলি। চাচার এ বিপদের সময় দানাপানি নিয়ে ক'দিন তার ওখান থেকে ঘুরে এলাম। নিতে চায় না। না খেয়ে মরলেও ও পরের জিনিস নেয় না। সিঁধ কাট্‌তে গিয়েছে বল্‌লেই আমরা বিশ্বাস ক'রব আর কী?

বাবুলাল কোন উত্তর দেয় না। একটু পরে বলে : এখন রাশেন, ধরা পড়লে কিন্তু মারা যাবি।

রোশেনালী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। বাহিরে বারান্দায় তেমনি শোনা যায় বুটপায় প্রহরীর চলার শব্দ !

টিফিনের ছুটি পাইয়া অগণিত মজুর কারখানার বাহিরে আসিয়াছে। প্রত্যেকের মুখেই আজ মাসান সম্বন্ধে সম্ভব-অসম্ভব নানারকমের কথা !

রোশেনালী ঐদিকে কয়েকজনের সাথে হল্লা বাঁধাইয়া দিয়াছে। তাহাদের সে কিছুতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারে না, মাসান চুরি করিবার লোক নয়। তাহারা বলে একটা-কিছু না হইলে আর শুধু শুধু আটকাইয়া রাখে নাই তাহাকে। রোশেনালী পথের মাঝেই তাহাদের সংগে মারামারি লাগাইয়া দেয় আর-কি, কি বাবুলাল ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় গোলমালটা থামিয়া যায়।

রোশেনালী গোঁ ছাড়িবার পাত্র নয়। সে এইমাত্র জঙলী বলিয়া মেয়ে-মজুরটার কাছে শুনিয়া আসিয়াছে যে কাল বৈকালে যখন মাসান কারখানার রেলিঙের পাশে দাঁড়াইয়াছিল তখন তাহাদের সরদার তাহাকে ধরিয়া সাহেবের কাছে লইয়া যায়। জঙলী কম্পাউণ্ডের বাগান সাফ করিবার সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বেমালুম উড়াইয়া দিলেই রোশেনালী শুনিবে আর কী ?

তর্ক করিতে গিয়া রোশেনালী একটা হাঙামা বাঁধাইবার উপক্রম করে দেখিয়া বাবুলাল তাহাকে টানিতে টানিতে ভিড়ের বাহিরে লইয়া আসে।

টিফিনের সময় প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। বড় রাস্তাটার ধারের বিরাট বাগানটার গাছপালার ছায়ায় একদল মজুর ভিড় করিয়া বসিয়া গিয়াছে। দলের মধ্যে বয়সে যে ছোট সে-ই ছোট কলিকাটি লইয়া গাঁজা সাজিবার উপক্রম করিতেছে। দলের মধ্যে ভিখা অনেকক্ষণ ধরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে কলিকাটির পানে চাহিয়া থাকে, এখনও বিলম্ব দেখিয়া রীতিমত অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। ছোড়াটার ঘাড়ে একটা ধাক্কা দিয়া বলে : কী রে শালা, এইটুকু সিদ্ধি সাজতে কী দিন ভোর কর্‌বি ?

ধাক্কা খাইয়া ছেলেটা রাগিয়া উঠে। গাঁজা সমেত কলিকাটি তাহার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া সে অদূরে গিয়া ঝিম মারিয়া বসে।

এই ঘটনায় ভিখার এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সযত্নে কলিকাটি তুলিয়া লইয়া সে গাঁজা সাজিতে মনোনিবেশ করে। ছেলেটা এদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে আর রাগে গজ্‌ গজ্‌ করে।

রাস্তা দিয়া জঙলী চলিয়াছে কারখানার দিকে। দলের ভিতর থেকে জমির চেঁচাইয়া উঠে : এই জঙলী শোন্ শোন্।

দলের আর সবাই জমিরের উপর রাগিয়া উঠে। এমন গাঁজার সময় আবার জঙলীকে কেন

জমির বলে : আরে, ভাই, রোশেন যে কেবল বল্‌ছে

জঙলী জানে মাসানকে শুধু শুধু ধ'রে নিয়ে গেছে। দেখিনা একবার শালী কি বলে!

দলের আর সবাই কোন আপত্তি করেন না। ভিখা কলিকায় টান দিতে সুরু করে।

জমিরের ডাক শুনিয়া জঙলী ফিরিয়া দাঁড়ায়। রাস্তার উপর থেকেই সে উত্তর দেয়ঃ ডাক্‌ছ কেন গা!

রোশেনালীর কাছে যাহা তাহারা শুনিয়াছে তার যথার্থতা সম্বন্ধে জমির জঙলীকে প্রশ্ন করে কিন্তু সে বলে সে কিছুই জানে না। অনেক পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও জমির তাহার কাছ থেকে কিছুই জানিতে পারে না। অপারগ হওয়ায় সে বেশ রাগতভাবে বলিয়া উঠেঃ তা আমাদের কাছে বল্‌বি কেন? ভারী ভাব আজকাল রোশেনের সাথে। সরদার যদি শোনে, তোর হাড়মাস্ দেখিস্ এক ক'রবে।

জঙলী কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া যায়; তাহার সম্বন্ধে নানারকমের মন্তব্য করিতে করিতে এরা আরামের সংগে গাঁজা টানে।

কলের প্রথম বাঁশি বাজিয়া উঠে। টিফিনের ছুটির পর কারখানায় ফিরে মজুরের দল!

রোশেনালী চুপ্ চাপ্ তাঁতঘরে কাজ করিয়া যায়। যন্ত্রপাতির খট্ খট্ শব্দ তার মস্তিষ্কে কোন চিন্তারই প্রশ্রয় দেয় না।

জঙলী তাঁতঘরের পিছন দিয়া ফুল বাগানের জন্য কলে জল আনিতে যাতায়াত করে। প্রতিবারই সে তাঁত-ঘরটার

কাছে দাঁড়াইয়া কার্যে নিবিষ্ট রোশেনের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য অপেক্ষা করে কিন্তু প্রতিবারেই সে বিফল হয়। এবার হাতের কাজ না থাকায় রোশেন বাহিরের দিকে তাকাইয়াছিল, জঙলীর অল্প চেষ্টাতেই তাহার ইসারায় নজর পড়িল।

তাঁত-ঘর হইতে অম্‌নি অম্‌নি এখন বাহির হইবার মোটেই উপায় নাই, প্রহরী স্বয়ং বারান্দায় খাড়া রহিয়াছে। সারাদিনের কাজের মধ্যে মজুররা একবার পায়খানা ও দুইবার প্রস্রাব করিবার ছুটি পায় কিন্তু ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া না আসিলে জরিমানা, এমন, কি বরখাস্ত পর্যন্ত হইতে পারে। রোশেনালী প্রহরীর কাছে গিয়া পায়খানা যাইবার পাশ চায়।

প্রহরী হিসাব করিয়া দেখে রোশেন সেদিন তখন পর্যন্ত পায়খানার ছুটি লয় নাই, সে বিনা ওজরেই পাশ দিয়া দেয়।

জঙলী কল খুলিয়া জল-সেচনীতে জল ভরিতেছিল। রোশেন ছুটিয়া তাহার কাছে আসিয়া চুপি-চুপি প্রশ্ন করে : কিরে, ডাক্‌লি কেন?

জঙলী মুখ তুলিয়া বলে : কী আরম্ভ করেছিস্ বল্‌তো, রোশেন। সবার কাছে তুই নাকি বল্‌ছিস্ মাসানকে ধরে নিয়ে যেতে আমি দেখেছি। সরদারের কানে কথাটা পৌঁছালে আমার যে নিস্তার থাক্‌বে না।

রোশেনালীর যেন মনে হইল কাজটা অন্যায়ই হইয়াছে কিন্তু এ লইয়া বেশি চিন্তা করিবার ধৈর্য তাহার নাই। সে উত্তর দেয়ঃ যা হবার হ'য়ে গেছে, জঙলী, আর বল্‌ছি না।

জঙলী তাহার কথায় হাসিয়া বলেঃ আর না বল্‌লে কি হবে, রোশেন! যা বল্‌বার সবার কাছে তো তুই বলেই ফেলেছিস্‌!

রোশেনালী নিজের ত্রুটির জন্য কোন কৈফিয়তই আর খুঁজিয়া পায় না। সে রীতিমত রাগের সংগে বলিয়া উঠেঃ তাতে হ'য়েছে কি জঙলী, দিক্‌না কেউ সরদারের কানে তুলে। তার মাথা আর ধড় আলাদা করে দেবোনা!

এতক্ষণে জঙলীর পাত্রটা ভর্তি হইয়া পড়িয়াছে। পাত্রটা তুলিতে তুলিতে সে উত্তর দেয়ঃ হাঁ, তুইতো সব ক'রবি!

'নাঃ, দেখে নিস্‌' এই বলিয়া রোশেনালী ফিরিবার উপক্রম করিতেছিল জঙলী বলিলঃ দাঁড়া, আর একটা নূতন খবর আছে। মাসানকে কারখানার বাইরে নিয়ে গেছে,—বোধহয় থানায়!

রোশেনালী সংবাদটা শুনিয়া মুষড়াইয়া পড়ে। সে বলেঃ সত্যি?

জঙলী উত্তর দেয়ঃ হ্যাঁ;—কিন্তু দেখিস্‌, আমার নাম করে কোথাও যেন গল্প করতে যাস্‌ নি।

রোশেনালী দ্রুতবেগে প্রস্থান করে। তাহার অস্ফুট উত্তর জঙলীর কানে গিয়া আর পৌঁছায় না।

* * * *

কল চলে—অবিরাম প্রচণ্ড গতিতে চলে, আর তার সাথে চলে মানুষ—মানুষের পর মানুষ এই কারখানায়, যার প্রাচীরের গায় মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া মরিয়াছে সমস্ত অনুভূতি,—সমস্ত আগ্রহ,—সমস্ত উদ্দীপনা।

চার

পাটের কল,—কলের পর কল গঙ্গার ধার দুইটা জুড়িয়া চলিয়াছে একটির পর একটি,...কলিকাতার উপকণ্ঠের এ পাটকল অঞ্চলটা চিম্‌নীর ধোঁয়া আর কলের শব্দে জাগিয়া থাকে দিনের পর দিন। সোয়াস্তি যেন নাই এর একটি মুহূর্তও।

এই যে এই বিরাট দিক্‌টায় চিম্‌নীর বুক থেকে ধোঁয়া বাহির হইয়া সারাদিন আকাশটাকে ধূমায়িত করিয়া রাখে এ শুধু নির্মম বঞ্চনার ভস্ম সেই হতভাগা মজুরদের, যাহারা এই সব অচলায়তন কারখানার অন্তরালে দিনের পর দিন খাটিয়া চলে—সেই চিরশোষিত চাষীদের, যাহারা রৌদ্র, জল, বৃষ্টি মাথায় করিয়া দুনিয়ার এ দুষ্প্রাপ্য অথচ আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য সামগ্রী জোগায়। এই যে প্রভাতের আকাশটাকে বিদীর্ণ করিয়া একটি পর একটি বাঁশি বাজিয়া উঠে এ ইহাদের আনন্দের আহ্বান ত নয়ই, শুধু একটা বিষাক্ত বঞ্চনার ডাক। ...তবু প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে চিমনীর বুক থেকে ধোঁয়া ও বাহির হয়, কলের বাঁশিও বাজে। বাঁশির ডাক ক্ষান্ত হয় না, ধোঁয়াও নিঃশেষ হয় না—বোঝার পর বোঝা পাট নিত্যই কারখানার দুয়ারে আসে, কলের কাজও চলে দিনের পর দিন...

*　*　*　*

পাটের কল চলে আর তার তলে খাটিয়া মরে মজত্নুর! পাটের মাল তাহারাই তাহাদের শ্রমশক্তি দিয়া নিত্য করে তৈয়ার কিন্তু তার যে একটা বিরাট লাভ তাহা সবই আত্মসাৎ করে পুঁজিবাদীর দল। উৎপাদনে সমভাবেই ত সহায়তা করে মাটি, অর্থ, সংগঠন ও শ্রম-শক্তি কিন্তু যাহার হাতে পুঁজি সেই যখন তাহার প্রভুত্ব বলে সব লাভই লইয়া যায় তখন সে শ্রম-শক্তি প্রবঞ্চিত ছাড়া আর কী? এমনভাবে প্রবঞ্চিত হইয়া তাহারা যাহা পায় তাহা যেমন তাহাদের সংসারের তুই বেলায় তুইখানা করিয়া রুটির উপযোগী নয়, তেমন শত নিপীড়ন ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া আবার সেটুকু হয় আদায়। পুঁজিপতির হাতে যতদিন ধরিয়া ঐ প্রভুত্বটুকু বিরাজ করিবে, শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার ও ন্যায্য অংশ চিরদিন এমন করিয়াই হইবে অবহেলিত আর উপেক্ষিত! মজত্নুর যেদিন পাইবে ঐ প্রভুত্বের ক্ষমতা, এ প্রবঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান সম্ভব শুধু সেইদিন…

বিরাট একটা ধর্মঘট সমগ্র পাটকল অঞ্চলটার বুকের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে মাত্র সেদিন…একটা আলোড়ন শ্রমিক-বস্তিগুলোর মধ্যে উঠিয়াছিল, মালিকদের প্রতিশ্রুতি আর সরকারের ভরসায় তার হইয়াছে বিরাম। এর ফলে যে আইন পাশ হইল তাহাতে চাষী-মজুরের স্বার্থ-রক্ষার নামে পাটকলওয়ালাদের সুবিধাই কেবল বজায় হইল ষোল আনা! সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া সরকার পুঁজিবাদীদের ভুলিয়া

হতভাগা নিরন্নদের পানে চাহিবে, এতো আজিকার তুনিয়ায় সম্ভব নয়।

* * * *

এখানকার চটকল মজুরদের ইউনিয়নটি ছোট হইলেও গত সাধারণ ধর্মঘটে ইহার কর্মীদের দান যৎসামান্য নয়, যার জন্য আজ সেদিনের একজন উৎসাহী কর্মী মাসান আজ কর্তৃপক্ষের কোপনজরে পড়িয়া বিনা দোষে হাজতবাস করিতেছে। সমগ্র পাটকল অঞ্চলটায় এরি মধ্যে নূতন আইনের প্রতিবাদের রেওয়াজ সুরু হইয়া পড়িয়াছে, তার একটা ঢেউ এ ছোট ইউনিয়নটায় সৃষ্টি করিয়াছে আলোড়ন।

কলিকাতা হইতে কয়েকজন শ্রমিকনেতা আসিয়াছেন সেদিন। ইউনিয়নগৃহের রুদ্ধকক্ষে সন্ধ্যাবেলায় এই পাট-আইন নিয়ে কর্মীদের সংগে তাঁহাদের চলিতেছিল আলাপ-আলোচনা। কিন্তু সকলের চিত্তে আজ ঘোর সংশয়—প্রতিবাদ, প্রস্তাব, ধর্মঘট কিছুরই উপর আর তাহাদের আস্থা নাই। এতদিন ধরিয়া ধর্মঘটের কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া আজ তাহারা যাহা পাইতেছে তাহা যেমন ভূয়া, তেমন তাহাদের আরও চাপিয়া রাখিবার নূতন ফন্দি যে ইহা, তাহারা এক রকম সবাই কিছুটা বোঝে।

সান্ন্যাল কলিকাতা হইতে আগত উদীয়মান শ্রমিকনেতা,—পাট-আইন লইয়া আজ তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ইউনিয়ন আর ইউনিয়ন। তিনি সবার মনে সংশয় ও

অবসাদের ছায়া দেখিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া আবেগময়ী কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : বন্ধুগণ, যে বৈষম্য, যে অন্যায়, যে অসামঞ্জস্যের উপর এইসব আইনের ভিত্তি, তাহা' চিরদিন টিকতে পারে না দুনিয়ায়। সবহারাদের অভিযান সে শুধু মুহূর্তের সাময়িক সুবিধা আদায়ের লাভলোকসানের খতিয়ান নয়, সে দিনের পর দিন এরই ভিতর দিয়া চলিয়া গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া চিরনিপীড়িতদের চিরআকাঙ্ক্ষিত সেই অনাগতকেই করিবে আমন্ত্রণ!

সান্ন্যালের গম্ভীর কণ্ঠস্বর কক্ষের চতুর্কোনে বাজিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চলিল নিঝুম নিরবতা!

সে নিরবতা ভংগ করিয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে সুরু করিলেন সান্ন্যালের সংগী আব্দুল বারি!—সেদিনকার সে সাধারণ ধর্মঘটের কথা হয়ত ভোলনি তোমরা, ভোলনি হয়ত তার সুখদুঃখ, ব্যথা আনন্দ বিজড়িত পীড়ন আর ত্যাগের কথা! কিন্তু তার চেয়েও বিরাট ও ব্যাপক একটা সংগ্রাম আমাদের সাম্‌নে, আরও দুঃখময়, আরও কষ্টকর! কিন্তু সবহারা আমরা, এই তো আমাদের প্রাপ্য, দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে এরই ভিতর দিয়েই তো আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য হয় জোগাড়্ যা' একদিন পুঁজিবাদী ও সবহারাদের চিরদ্বন্দ্বের করবে শেষ মীমাংসা! বন্ধুগণ, আজ তারই জন্যে প্রস্তুত হ'তে তোমাদের আহ্বান করি।

বারি কিছুক্ষণের জন্য আবার নিরব হইলেন। সমাগত ইউনিয়ন কর্মীদের মধ্যে একটা গুঞ্জন সুরু হইয়া গেল।

বারি তাঁহার বন্ধু নেতাগণের সহিত সামান্য কিছুক্ষণের জন্য আলাপ-আলোচনা শেষ করিয়া আসিয়া আবার সকলকে সম্বোধন করিয়া সুরু করিলেন: নূতন আইন যে কতখানি ক্ষতিকর চটকল মজুরদের পক্ষে, তা' বোধহয় কতকটা সবাই বোঝে। পঁচিশ হাজার মজুর আজ কর্মচ্যুত। প্রত্যেকের মাহিনা যদি গড়ে পনের টাকা ধরা যায়, তাহ'লে এখানে শ্রমিকদের লোকসান মাসিক তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা —এছাড়া প্রত্যেক মজুরের বেতন মাসিক শতকরা ষোল টাকা ছাঁটাই হওয়ায় পাটকল অঞ্চলের তিন লক্ষ মজুরের বাবত মাসিক সাড়ে সাত লক্ষ টাকা লোকসান। অতএব আজ এই আইনের জন্য বাঙলার চটকল মজুররা মাসে এগার লক্ষ টাকা লোকসান ভোগ ক'রছে কিন্তু মালিকদের সকল স্বার্থই বজায় থাক্‌ছে ষোল আনা!

শ্রোতাদের মধ্য থেকে বাবুলাল বলিয়া উঠে: সরকার তাহ'লে আমাদের জন্য কিছুই করলনা, কলওয়ালাদের গোঁ-ই বজায় রইল।

বারি বাবুলালের কথার উত্তরে বলিলেন: হাঁ, তাদেরই স্বার্থ বজায় রইল।......কিন্তু এতো জানা কথা! সাম্রাজ্যবাদী সরকার সাম্রাজ্যবাদের যারা চাঁই তাদের স্বার্থ তো ঠেল্‌তে পারেনা ভাই।

এতক্ষণে আসরে চা আসিয়া পড়িল। চা পান করিতে করিতে আব্দুল বারি বলিতে লাগিলেন: এই যে কলের

মালিক এরা একটা সুনিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চলে—পাটচাষ, পাটের মূল্য, কলের মজুর সব-কিছু এরা এদের নিজেদের আয়ত্বাধীনে রাখবার প্রয়াস পায়। সাম্রাজ্যবাদী সরকার এদের পুরোপুরি সহায়তা না ক'রে পারে না—চাঁইদের আব্দার অবজ্ঞা করা ত সহজ নয়! কত কারসাজি এ মালিকদের! এদের আর্থিক ও রাজনৈতিক শক্তি এত অধিক যে এরা ইচ্ছা ক'রে পাটের দর কমাতে পারে এবং তাই এরা করে। এই ভাবে মজুরদের চেয়েও যারা হতভাগা সেই চাষীদের প্রবঞ্চিত ক'রে কেমন ভাবে এরা সস্তায় পাট কেনে তাও চমৎকার!

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে উদ্যোগী কর্মী ও নায়ক সনৎ বলিয়া উঠিল: এর জন্য আমাদের যেমন লোকসান, চাষীদেরও তো তেমনই লোকসান!

ভৌমিকের চা পান সবে মাত্র শেষ হইয়াছিল। তিনিও কলিকাতা হইতে সান্ন্যাল ও আব্দুল বারির সংগে আসিয়াছেন। রুমালে মুখটা মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন: হাঁ, চাষীদেরও লোকসান। চাষীদের লোকসান চটকল মজুরদের লোকসানেরই মত। অন্য বৎসর পাটের উৎপাদন হয় প্রায় পাঁচ কোটি মণ কিন্তু এ বছর দারুণ বন্যা হওয়ায় সে স্থলে হ'ল প্রায় সাড়ে তিনকোটি মণ। বন্যার খবর হ'তেই পাটের দর বাড়্তে বাড়্তে প্রায় সাতটাকায় এসে দাঁড়াল—মনে করা গিয়েছিল চাষীরা বেশ-কিছু পাবে কিন্তু সহসা এই

আইন ধুমকেতুর মত উদয় হ'য়ে কলের মালিকদের শতকরা ষোল ভাগ পাট ক্রয় কম করার সুযোগ দিল ; ফলে, পাটের দর নেমে প্রতি মণ হ'ল পাঁচটাকা। সাড়ে তিন কোটি মণই যদি পাটের উৎপাদন এ বছর ধরা যায় তাহ'লে এদের লোকসান হ'চ্ছে মোট সাত কোটি টাকা। আজিকার এ তুনিয়ায়, ভাই, চাষী ও মজুরের সমস্যা পৃথক হ'লেও পরিস্থিতিটা কিন্তু একই !

ভৌমিকের কথার সংগে কথা মিলাইয়া সান্ন্যাল বলিয়া উঠিলেন ঃ ভারতের চাষী, ভারতের মজতুর—এরা তুনিয়ার হতভাগা, সবচেয়ে হতভাগা !

আরোও কিছুক্ষণ ইহাদের আলাপ-আলোচনা চলিল,—একে একে সবাই বিদায় লইতে লাগিল, অন্ধকার নিশীথে রুদ্ধকক্ষে ধ্বনিত হইয়া উঠিল সমস্বরে

'লাল ঝাণ্ডা কী জয়।'

* * * *

সভার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, যে যাহার ঘরে ফিরিয়াছে—একা সনৎ হরলালের সংগে ইউনিয়নের কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিয়া কেবলমাত্র বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় রোশেনালী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল ঃ সভা হ'য়ে গেছে—কোলকাতার বাবুরা······ ?

"হ্যাঁ, তাঁরা চলে গিয়েছেন কিন্তু কি খবর ?" সনৎ প্রশ্ন করে।

'চাচার জেল হ'য়ে গেল এক বছর।' রোশেনালী উত্তর দেয়।

সনৎ খাতাপত্তরগুলো যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলে : কি বলিস্, সর্বনাশ, এক বছর ! উকিল কিছুই করতে পারল না ?

রোশেনালী উত্তর দেয় : না, উকিলে কিছুই হ'ল না। ওদের সাক্ষী সাবুদে যা ব'লল তা' উকিল আর কাটাতে পারল না। এক বছর জেল !

রোশেনালী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল : চাচি আমার পথের দিকে তাকিয়ে আছে,—কখন আমি মহকুমা থেকে ফিরব ! স্টেশনে নেমে আর আমি দাঁড়াইনি, সটান এখানে চলে এসেছি। কি যে গিয়ে তাকে এখন বলব !

সনতের হাতের কাজ পড়িয়া থাকে। তাহারও চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল। রোশেনালীর হাতদুইটা ধরিয়া সে বলে : কি আর ক'রব আমরা, রোশেন ! আমরা যে নিরুপায় !

* * * *

অন্ধকার নিশীথিনী, বাহিরে……চারিদিক নিরব নিঝুম। পথে নাই কোন শব্দ,—শুধু কেবল পাওয়া যায় দূরে নূতন কাগজকলের আর বয়লারের আওয়াজ। সারা রাত তার বিরাম নাই।

পাঁচ

বয়লারের গর্ভে মুহূর্তের পর মুহূর্ত বাষ্প সঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে, নিমেষের মধ্যে তাহাই আবার পাইপের ভিতর দিয়া গিয়া ইঞ্জিনঘরের ফ্লাই-হুইলটাকে চালাইতেছে। সংগে সংগে ইহার সংযোগে রশিগুলির প্রথম পুলি ও হুইল চলিতে সুরু করিয়া দেয় এবং পর মুহূর্তে ইহার সহিত যোগাযোগ থাকায় অন্যান্য পুলি ও হুইল পর-পর চলে!

কোন্ একটা জায়গায় কয়লার আগুনে জল ফুটিয়া বাষ্প তৈয়ার হইতেছে, আর তাহারই গুণে সমস্ত কারখানার বিভিন্ন অংশগুলো নির্বিবাদে চলিতেছে—এ আশ্চর্য সন্দেহ নাই। এই যে কল-কব্জা, লোহালক্কড়—এই যে তাহাদের চলার শক্তি এ সৃষ্টি এই মানুষদেরই—যাহারা আজ দুইবেলার দুইমুঠো ভাতের জন্য ইহাদেরই তালে তালে অকাতরে খাটিয়া চলিয়াছে। নির্মম ভাগ্যের বিপর্যয়ে আজ তাহারা এই কল-কব্জা বাষ্পেরই দাস, একদিন যার উদ্ভাবন তাহারাই করিয়াছিল,—একদিন যার সৃষ্টি তাহাদের হাতেই সম্ভব হইয়াছিল।

আদিম যুগের মানুষ গাছের বাকল পরিয়া পাথরের কুচিতে পশু শিকার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির বন্দোবস্ত করিত। সেই দিনকার সেই মানুষ আপনার অবস্থার মধ্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারে নাই—সহজ ও দ্রুত পায়ে ক্রমবর্ধমান দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদের চলিল

প্রচেষ্টার পর প্রচেষ্টা। ইহার সাফল্যের মধ্য দিয়া ক্রমশ তাহাদের মিলিতে লাগিল অবসর,—আজিকার এই কাব্যকলা শিল্প-বিজ্ঞানের জন্ম যাহার জন্য হইয়াছে সম্ভব। সেদিনকার সে-মানুষ আজ আর নাই—হয়ত আর আসিবে না কিন্তু তাহাদের জীবনান্ত পরিশ্রমের জন্য মানুষ অর্জন করিল দিবারাত্র কাজের মধ্যে যে অবসর তাহাই আজ গড়িয়া তুলিয়াছে বর্তমানের নূতন সমাজ। যুগে যুগে মানুষের শ্রমে গড়া এই অবসরের সুযোগ যাহারা গ্রহণ করিল, তাহারা সমাজের মাথায় উঠিয়া বসিল আর চিরদিনের জন্য নিচে পড়িয়া রহিল তুনিয়ার হতভাগা মজতুর !

রশিগুলির প্রত্যেকটি পুলি ও হুইল পরস্পর যেমন চওড়া ও পুরু চামড়ার ফিতা দ্বারা সংযুক্ত, তেমনই পার্শ্ববর্তী কামরার পর-পর-সাজানো কলগুলোর প্রত্যেকটির সহিত এক-একটা পুলি ও হুইলের ঐ একই ভাবে যোগাযোগ রহিয়াছে। পুলি ও হুইল চলিতে সুরু করিয়া দিলেই ল্যাণ্ডশ্যাফ্ট্, রোপিং মেশিন, ড্রাণ, ক্লিয়ার ব্রাকার, শফ্নার প্রভৃতি কলগুলোও পর-পর তেমনই চলিতে সুরু করিয়া দেয়।

কারখানার কাজ আরম্ভ হয়।

কলের হেড্মিস্ত্রী করিম খাঁ আজ কারখানার সমস্ত কল-কব্জা পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছে—কোথাও কিছু মেরামত কিংবা পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন আছে কি-না তাহাই নিবিষ্টমনে দেখিয়া দেখিয়া চলিয়াছে সে।

ল্যাণ্ডশ্যাফ্‌টে তখন সনৎ কাজ করিয়া যায়। মাথার উপর তাহার কল চলে অবিরাম গতিতে, ঘর্ঘর শব্দে সমস্ত ঘরখানা মুখরিত হইয়া উঠে। পৃথিবীর আলো এখানে প্রবেশ করিতে পারে না এতটুকু, ইলেক্‌ট্রিকের বাতি ঘরের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়। বাহিরের বাতাস এখানে আসে না। মাথার উপর দিবারাত্র কল ঘোরে আর তারই তলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবিরাম কাজ করিয়া যায় ল্যাণ্ডশ্যাফ্‌টের এই যুবক মিস্ত্রী।

অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে যুবকের বলিষ্ঠ দেহ বহিয়া ঘাম ঝরিয়া পড়ে ফোঁটা ফোঁটা কিন্তু তবুও তার বিশ্রাম লইবার অবসর নাই। মেঝেয় পাতা কল তার মাথার উপরকার কলের সংযোগে অনবরত ঘুরিয়া চলে আর তার সাথে তাল ফেলিয়া কাজ করিয়া যায় যুবকের দৃঢ় দুইখানি কব্জি।

হেড-মিস্ত্রী করিম খাঁ কল পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে ল্যাণ্ডশ্যাফ্‌টে আসিয়া পড়ে। কল অবিরাম গতিতে চলে আর করিম খাঁ অপলকনেত্রে কলের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি দেখিয়া যায়। কাজ শেষ হইলে করিম খাঁ যুবক মিস্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলেঃ সনৎ, কলে কি গোলমাল আবার সুরু করছ, শুন্‌ছি ?

মিস্ত্রী সনৎ যদিও করিম খাঁর অধীনস্থ মজুর তবুও শিক্ষার দিক দিয়া এ হেড্‌মিস্ত্রীর চেয়ে অনেক বড়। আই, এস্‌, সি পাশের পর অন্য কোনরকম সুযোগ সুবিধা না হওয়ায় সে এই

কলের চাকুরিতে ঢুকিয়া পড়ে। কিছুদিন শিক্ষানবিশি করার পর সে এই ল্যাণ্ডশ্যাফ্‌টের কাজে আসে এবং ব্যবহার ও গুণে অল্পদিনের মধ্যে হেড্‌মিস্ত্রী করিম খাঁর এতখানি সুনজরে পড়ে যে তাহাকে হেডমিস্ত্রীর একজন অন্তরংগ আত্মীয় লোক বলিলেই হয়।

সনৎ হেড্‌মিস্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলে: গোলমাল আজ হ'ক কাল হ'ক একদিন ত সুরু হ'তই, খাঁ সাহেব! নূতন আইনের প্রতিবাদ ত এরি মধ্যে বেশ ভালরকমেই দেখা দিল কিন্তু আমাদের এ কলে তার পূর্বেই হয়ত ধর্মঘট এসে পড়ল। মাসানকে জেলে দিয়েও কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হ'ল না। তারা মাসানের ব্যাপারে বাবুলাল, রোশেনালী ও জঙলীকে বরখাস্ত ক'রেছে। আমাদের আর দোষ কি বলুন! কর্তৃপক্ষ আজ জোর ক'রে আমাদের গোলমালের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—অন্যায়ের পর অন্যায় ক'রে চলেছে। আমাদের ইউনিয়নে আমরা স্থির ক'রেছি, এই অন্যায় আমরা কিছুতেই আর বরদাস্ত করব না।

'কিন্তু কি ক'রবে'? করিম খাঁ প্রশ্ন করে। সনৎ উত্তর দেয়: আমরা ধর্মঘট ক'রব। একজোটে আমরা সবাই কাজ বন্ধ ক'রব। সেবার আমরা হারিনি। এবারও যে আমরা হারব না এ বিশ্বাস আমাদের আছে। "কিন্তু তাতে চারদিকে আবার যে সেদিনকার মত অশান্তির সৃষ্টি হবে তা কি বোঝ না?" করিম খাঁ বলে।

সনৎ উত্তর দেয়ঃ কিন্তু এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের আজ কথা বলবার প্রয়োজন আছে। গতবারের ধর্মঘটে মাসান সবচেয়ে বেশি কাজ করেছিল, কর্তৃপক্ষের সাথে সেই সবার আগে গোলমাল স্থরু ক'রেছিল। সেই রাগেই তো সামান্য দোষে এরা মাসানকে একটু ছুতোতে জেলে পাঠাল। আবার বিনাদোষে এদের বরখাস্ত করল। এ সবের মূল তো সেই গতবারকার ধর্মঘটের আক্রোশ। আজ যদি আমরা এ অবিচারের বিরুদ্ধে একযোগে না দাঁড়াতে পারি, তাহ'লে লজ্জায় আমাদের মাটির সংগে মিশে যাওয়া উচিত।

করিম খাঁ কিছুক্ষণের জন্য নিরব থাকে। তারপর খানিক কি ভাবিয়া বলেঃ সনৎ, আমার ঘাড়ের উপর কারখানার দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার ন্যস্ত থাকা সত্বেও আমি সেবারকার ধর্মঘটে তোমাদের সহায়তা করতে এতটুকু কার্পণ্য করিনি। আজও তোমাদের সকল রকম কাজে আমার যোগ দিতে বিন্দুমাত্র অসম্মতি নাই কিন্তু আমি বুঝে পাই না, সনৎ, এই সব গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া মজুরের দল এইভাবে যুঝে প্রতিদানে কি পায়।

সনতের হাতের কাজ সমভাবেই চলে। কাজ করিতে করিতে সে বলেঃ পায়, খাঁসাহেব, পায়, কিন্তু লাভ-লোকসানের খতিয়ান করবার এখন কিছুই নাই। আজ যদি আমরা আমাদের সহকর্মীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু ক'রে না দাঁড়াই, এই কারখানার পাঁচিলের আবেষ্টনীর মধ্যে অমনতর সহস্র অন্যায় ও অবিচার

প্রতিমুহূর্তে জন্মগ্রহণ ক'রে আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে। এ কথা কি আজ আমাদের ভুল্‌লে চলে, খাঁ সাহেব!

খাঁ সাহেব আর কোন কথা বলিল না। ল্যাণ্ডশ্যাফ্‌টে তার যেটুকু কাজ বাকি ছিল তাহা শেষ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া যায়। ল্যাণ্ডশ্যাফ্‌ট ঘরে, মেঝেয় ও ছাদে কল সমভাবেই চলিতে থাকে। কলের ঘর্ঘর শব্দের মাঝে মিশিয়া যায় সনতের বুকের স্পন্দন, ইন্দ্রিয়ের নিশ্বাস।

বিরামহীন কর্মের মধ্যে সারা কারখানা-বাড়ীর মজুরের দল আগ্রহে অপেক্ষা করিতে থাকে কখন মিলিবে দুপুরের আধঘণ্টা অবসর।

ছয়

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে সারা শহরটার গায়······

শহরতলির বাজারটার ভিতর দিয়া যে রাস্তা চলিয়াছে তার দুই ধার দিয়া দোকানে দোকানে আলো জ্বলিল একটির পর একটি······। সারাদিনের পরিশ্রমের পর নিজেদের ডেরায় ফিরিয়াছে মজুরের দল······ছেলেমেয়েরা তাদের সওদা কিনিবার হিড়িক লাগাইয়াছে দোকানে দোকানে······ ছোট্ট বাজারখানা মুখরিত করিয়া তোলে কলরব আর কোলাহল।

কারখানা হইতে ফিরিয়া স্নান সারিয়া সনৎ ঢুকিল তাহার অল্পপরিসর ঘরখানায়। উনানটা ধরাইয়া চায়ের জল ফুটাইতে গিয়া সে দেখিল কৌটায় চিনি নাই······

বস্তির পর কারখানা······তারপর বাজার। কারখানা এলাকাটায় ছোট ছোট লাল রাস্তা চলিয়াছে এদিক-ওদিক। দুইধার দিয়া চলিয়াছে ঝাউগাছের সারি। ঘনগাছের ছায়ায় সন্ধ্যার সবখানি অন্ধকার যেন জমাট বাধিয়াছে···রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোও যেন সেখানে প্রবেশ করিতে ভয় পায়।

সনৎ চিনি আনিতে চলিল বাজারের গানে এই পথে।

পথে এখন লোকজনের চলাচল তেমন নাই। রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক নিরব, নিঝুম। দূরের কারখানা-বাড়ীটা

সারাদিন ধরিয়া গর্জন করিয়া এখন যেন পরিশ্রান্ত···নিস্তব্ধ। দুই একটা ছেলেমেয়ে তখনও সওদা সারিয়া বস্তির ডেরায় ফেরে।

চারিদিককার এ নিস্তব্ধতার মাঝখানে সাহেবদের বাড়ীর আনন্দের রব ফুটিয়া উঠে···রেডিওর গান, পিয়ানোর সুর আর সুখী-সংসারের আমোদোচ্ছ্বাস!

রাস্তার যেখানটায় সবচেয়ে অন্ধকার সেইখানে আসিয়া সনৎ হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়ায়। এত অন্ধকারের মধ্যেও সে বেশ দেখিতে পায় যেন একটা মেয়ে সওদার থলি হাতে ঝাউগাছের ছায়ায় গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মেয়েটার কাছে আসিতেই সে সনৎকে দেখিতে পাইয়া একেবারে কাছে ছুটিয়া আসে। এতক্ষণ ধরিয়া একটা রুদ্ধ ক্ষোভে যেন সে ফুঁপাইতেছিল, পরিচিত একজন আপনার লোককে সাম্‌নে পাইয়া আর সে নিরব থাকিতে পারিল না। যে কান্নার আবেগটুকু সে চাপিয়া গুম্ হইয়াছিল, তাহা আপনিই বাঁধ ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে সনৎ তাহার পিঠের উপর ডানহাতখানা রাখিয়া বলে: কি হ'ল তোমার, লতা!

সান্ত্বনা যখন প্রিয়জনের নিকট হইতে আসে, দুঃখ যেন তখন না কমিয়া আরও বাড়িয়াই যায়। লতা আশ্বস্ত হওয়া ত দূরের কথা, সামান্য এই আদরে সে আরও কাঁদিয়া ফেলে। হাতের থলিটা রাস্তার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে

অশ্রুসিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠে : ও পোড়া বাজারে আমি আর যাবো না, এ ছাই সওদা আমি আর করব না, সন্নুদা !

লতার এই আচরণে সনৎ যেমন হইল আশ্চর্য, তেমন হইল বিমূঢ়। সওদার জিনিষগুলো রাস্তার উপর এদিক-সেদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেগুলো কুড়াইয়া সওদার থলিটায় ভর্তি করিতে করিতে সনৎ তিরস্কারের ভংগিতে বলিয়া উঠে : এমন কি হয়েছে, লতা, যার জন্য তুমি এতগুলো জিনিষ এমন ক'রে ফেলে দিলে ?

সনতের কথার সংগে সংগেই লতা অনেকখানি রোষের সাথে বলিয়া উঠে : ফেলে দিই কি আর সাধে ! রোজ রোজ দোকানদারদের সেই একই কথা। একবার শুনে এসো না, তারা আমায় কি বলে ! দুটো কান দিয়ে শুনেও যদি সয়ে থাক্‌তে পারো তবে ব'লব তোমার সহ্যগুণ অসীম...... একদিন না, দু'দিন না—রোজরোজ ঐ একই কথা।......

লতা লতার মতনই মেয়ে...কথাগুলো তাহার বড় তীক্ষ্ণ। তীক্ষ্ণ বলিয়াই তাহা মানুষের বুকে বিঁধে। সনতের বুকেও তা বিঁধিল কিন্তু সে এতটুকু অধীরতা প্রকাশ করিল না। ধীরভাবে সে বলিল : কী তারা বলে, লতা ?

—'বলে, করিম খাঁর আমি মেয়ে না, করিম খাঁ আমার জন্মদাতা পিতা নয়। ছোট্ট শিশু যখন আমি মার কোল আঁকড়ে ধরে পড়েছিলাম, করিম খাঁ তখন আমার মাকে......

লতার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। সনৎ হঠাৎ নিজের হাতের তালুতে তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল: চুপ্ কর, লতা, চুপ্ কর। এ সব কথা তোমার নিজের মুখ থেকে বার না হ'লেও চল্‌তে পারে আর যখন আমি সবই জানি।

লতা জোর করিয়া নিজের মুখ হইতে সনতের হাতটা সরাইয়া কাতরস্বরে বলিয়া উঠে: কি তুমি জান, সনুদা? বল, তুমি কি জান? আমি জান্‌তে চাই আমি কে, কোথায় আমার স্থান!

"কিন্তু সেটা আজ এখন না জানলেও হয়তো চলতে পারে, লতা! উনুনটায় আঁচ দিয়েই দেখি কৌটায় একটুও চিনি নেই। তাই আনবার জন্য এখন বাজারে চলেছি। কল থেকে ফিরে এসে খালি পেটটায় এখনও কিছু পড়ে নি···এক চুমুক চাও নয়।" সনৎ উত্তর দেয়।

পিছনে একটা মোটরকারের হর্ণ শোনা যায়। সনৎ লতার হাতটা ধরিয়া রাস্তার এক পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। খানিক ধূলা-বালি উড়াইয়া মোটরখানা সাহেববাড়ীর ফটকের ভিতর চলিয়া যায়।

লতার হাতখানা নিজের মুঠার মধ্যে লইয়া সনৎ বলে: লতা, এমনভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে খোস গল্প ক'রতে গেলে মোটর-চাপা প'ড়তে হবে। তার চেয়ে তুমি বাসায় ফের, আমি বাজারে যাই।

লতা উত্তরে বলেঃ মোটর চাপার ভয়ে যে তুমি আর বাঁচ না সনুদা। মরবার তোমার এত ভয়!

—হ্যাঁ, মরবার আমার বড় ভয়, অমন ক'রে মরতে আমার মন চায় না কোনদিন। সুখ-সম্ভোগের উন্মাদনায় ওরা অমন প্রচণ্ড গতিতে মোটর চালিয়ে যাবে আর শুক্‌না পেটে খামকা ওর তলায় মারা যাব, এ আমি ভাব্‌তেও পারি না!

লতার মুখ থেকে এর উত্তরে কোন কথাই বাহির হইয়া আসে না।

সনৎ ডান হাতে লতাকে বুকের কাছে টানিয়া লয়। তারপর অন্য হাতে তাহার মাথার চুলগুলো নাড়িতে নাড়িতে বলেঃ এই চারপাশে আজিকার যে সমাজ দেখ্‌ছ, এর লোক যেমন আমরাও নই, তুমিও তেমন নও। আত্মীয়-পরিজন ছাড়া, ভিটেমাটিহারা আমরা দিনের পর দিন ঐ পাঁচিলের ভিতর খেটে শরীরের রক্ত জল ক'রে পুঁজিপতি বণিকদের সুখ-সম্ভোগের উপকরণ জোগাই কিন্তু এর প্রতিদান কী জান, লতা!

লতা সনতের বাহুবন্ধনের মধ্য থেকেই বলেঃ কী?

সনৎ সুরু করেঃ পোড়া পেটে ঠিক মত দানা পড়ে না, অসুখে ওষুধ মেলে না, পথ্যি পড়ে না। দুনিয়ার সাধ-আহ্লাদের আস্বাদ নেবার অবসর হয় না!

লতা নিজেকে সনতের বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লয়। নিরবে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর পানে তাকাইয়া থাকে। কিছুক্ষণ আর কোন কথাই হয় না।

এ নিরবতা সনতের যেন ভাল লাগিতেছিল না। সে আবার বলে: চাকুরির আশায় এখানে এসে তোমাদের বাড়ীতে যখন আশ্রয় পাই, তখনকার দিনের কথা হয়ত এখন তোমার মনে নেই। কত রাত এমনি তুমি আর আমি এ শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন আমি পুরাদস্তুর মজদুর, অনেকদিন তাই আর তেমন ক'রে বেড়ানো হয় নি। চল, আজ দু'জনে খানিকটা ঘুরে আসি।

কল-বাড়ীর পাশের রাস্তাটা দিয়া সন্ধ্যার পর চলা-ফেরা করিবার হুকুম কোন মজুরেরই নাই। ইহারা তাই কল-বাড়ী ও সাহেবদের বাড়ী ডানহাতে ফেলিয়া অনেকটা দূর ঘুরিয়া গঙ্গার ধারের দিকে চলিল। পথ চলিতে চলিতে সনৎ বলে: এই যে চারিদিককার সুরম্য বাসস্থান আর তার ভিতরকার সুখের আতিশয্য, তা উপহাস করে আমাদের তিক্ত জীবন-যাত্রাকে,—উপহাস করে আমাদের বস্তির ছোট ছোট কুঠ্‌রিগুলোকে,—উপহাস করে আমাদের অনাহারী অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে!

লতা সনতের পাশে পাশে অগ্রসর হয়। কথাগুলো মন দিয়া শুনিয়া খানিক সে কি চিন্তা করে। তারপর বলে: করিম খাঁর কোঠাবাড়ী আর গয়না কাপড়ের মধ্য থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আস্‌তে পার সনুদা? আমি যে তাহ'লে বেঁচে যাই।

"কেন?" সনৎ প্রশ্ন করে।

"'তোমাদের যে এত দুঃখ, এত ব্যথা, এত কষ্ট।" লতা উত্তরে বলে।

গঙ্গার জলীয় হাওয়ার স্পর্শ আসিয়া লাগে ইহাদের গায়। দিবসের পরিশ্রমে খিন্ন সনৎ যেন বেশ খানিক সোয়াস্তি পায়। ওপারে বৈদ্যুতিক আলো মিটিমিটি জ্বলে। গঙ্গার পাড়টা তখন একেবারে নিঝুম।

বাঁধান ঘাটের সিঁড়িটার উপর গিয়া সনৎ বসিয়া পড়ে।

খানিক দুইজন চুপ্ চাপ্ গঙ্গার স্নিগ্ধ আবহাওয়া উপভোগ করে। রজনীর এ স্তিমিত অন্ধকারে গঙ্গার এই নির্জন ঘাটে নদীর জলকল্লোল শুনিতে শুনিতে ইহারা যেন চলিয়া গিয়াছে কতদূর.........

সহসা সনৎ যেন তাহার পিঠের উপর অনুভব করে কাহার একখানা হাতের স্পর্শ। চমকিত হইয়া ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিতে পায় পাশেই দাঁড়াইয়া হরলাল।

সনৎ কোন কথা বলিবার আগেই হরলাল একেবারে তাহার সামনে আসিয়া বিদ্রূপ সহকারে বলিয়া উঠে: এই অন্ধকার রাত্রে কুমারী মেয়ের সাহচর্যে বেশ ভুলে থাকা যায় মজুরদের ব্রত,—মজুরদের ব্যথা!..........না?

সনৎ তাহার কাঁধের উপর নিজের দুইখানি হাত রাখিয়া বলিয়া উঠে: এসব কী বল্‌ছ, হরলাল?

হরলাল উত্তরে বলে: হ্যাঁ, ঠিকই বল্‌ছি। এ ক'দিনকার আমাদের আপ্রাণ চেষ্টায় সব বস্তিগুলোর প্রায় অধিকাংশ

মজদুর ধর্মঘট ক'রতে রাজি। জীবনের তিক্ততায় আসন্ন সংগ্রামের উল্লাসে তাদের অন্তর আজ উদ্গ্রীব। এ সময় তোমাকে যদি আমাদের মধ্যে না দেখে এখানে পাই তা'হলে একথাটা বলা বোধ হয় অনুচিত হয় না।

লতা এতক্ষণে তাহাদের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতেছিল কিন্তু যখন সে বুঝিতে পারিল তাহাকে লইয়াই এসব কথা, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারে না। সনৎ হরলালের কথার উত্তর দিবার আগেই, লতা সিঁড়ি ছাড়িয়া একেবারে তাহাদের সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইয়া বলে: হ্যাঁ, অনুচিত! তুমি যে জিনিষটার ইংগিত ক'রেছ, হরলাল, আমি তা' নই। আজ আমি তোমাদেরই মত একজন······গৃহছাড়া, সর্বহারা।

লতার কথার সংগে সংগে সনৎ বলে: আর তা' ছাড়া মজুরদের কাজে লতা করবে দান, যা' ছাড়া ধর্মঘটের প্রথমটায় আমরা চ'লতেই পারব না, হরলাল।

হরলাল প্রশ্ন করে: কী সে?

সনৎ উত্তর দেয়: করিম খাঁ কলের হেড্ মিস্ত্রী, মাসিক তার আড়াই শ' টাকা উপায়।······আর তা'ছাড়া লতার আছে গয়না আর বাপ-মার দেওয়া টাকাপয়সা।

'···কিন্তু লতা তো করিম খাঁর মেয়ে নয়, তার রক্ষিতার···'

হরলাল কথাটা শেষ করিতে না করিতে সনৎ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠে: চুপ কর, হরলাল।

হরলাল কিন্তু দমিল না। সে বলিয়া উঠে : চুপ ক'রব কী—যা সত্যি তাইত বল্‌ছি। এতদিন এটা একটা গুজবের মতই ছিল কিন্তু সম্প্রতি যে লোকটা বাজারে নূতন স্‌টেশনারী দোকান খুলেছে সে নাকি করিম খাঁর দেশের লোক। তার মুখেই প্রকাশ, লতার মা দেশের এক বামুনের ঘরের বৌ ছিল। লতা যখন ছোট শিশু, তখন সে শিশু সন্তানটিকে নিয়ে করিম খাঁর সংগে দেশত্যাগিনী হয়! সে অবধি তারা এই ভাবে বসবাস ক'রে আস্‌ছে।

লতা কি যেন বলিতে চায় কিন্তু সনতের কণ্ঠস্বর সে অস্ফুট প্রশ্নকে ছাপাইয়া উঠে।

সনৎ বলে : কিন্তু এদের ছু'জনাকে যদি আমরা স্বামী স্ত্রী হিসাবেই দেখি তা'হলে কি কোন আপত্তি থাক্‌তে পারে?

হরলাল উত্তরে যেন কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সনৎ তাহাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বলিয়া উঠে : জানি তুমি ব'লবে, আজ্‌কার সমাজ এই দুটি বিভিন্ন ধর্মের নর-নারীর এমন আইন-অসংগত মিলন বরদাস্ত ক'রতে পারে না কিন্তু তুমি কি এটুকু স্বীকার কর'বে না লতার মার পূর্বেকার বিবাহ-বন্ধনের চেয়ে আজ্‌কার মিলনের স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা অনেক বেশি?

হরলাল একটা অস্ফুট উত্তর দেয় : কেন? সনৎ উত্তরে বলে : কেন, মানে হ'চ্ছে এই যে, সে সংসারে বাস ক'রবার আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা তার এতখানি ছিল না যতখানি আজ

এখানে আছে। অতএব বর্তমান মিলনই যে মংগলকর তা নিঃসন্দেহ।······তবে সমাজ, অনুশাসন ইত্যাদি।······কিন্তু সমাজ অনুশাসন মানুষের জন্য, মানুষ ত আর তাদের জন্য নয়! বর্তমান সমাজ যদিও তাই তাদের ঘৃণা ক'রে দূরে রাখে—যে সমাজের দিকে আমরা আজ এগিয়ে চ'লেছি সেখানে তাদের অকাতরেই মিল্‌তে পারে আশ্রয়, স্থান, সব-কিছু।

লতার এসব আলাপ আর ভাল লাগিতেছিল না। রাত্রি আরও অধিক হওয়ায় চারিদিকটা অনেকখানি নিঝুম হইয়া আসিয়াছে। এতক্ষণে হয়ত বাড়ীতে সকলে তাহার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। সে তাহাদের কাছে বিদায় চাহিল।

লতা প্রস্থান করিলে পর কিছুক্ষণ তুইজনার মধ্যে কোন কথাই উঠিল না। সনৎ প্রথমে নিরবতা ভংগ করিয়া বলিল: বহুদিনের সংস্পর্শে লতার মার যে পরিচয় পেয়েছি, হরলাল, তাতে ক'রে কলংকের কাহিনী ছাপিয়ে জাগে একটি স্নেহশীলা জননীর গরিমা। আমরা মজতুর······মজতুর-সমাজের লোক আমরা, আমরাও কি ঐ ভূয়ো সমাজের ধূয়ো ধরে তাকে হেয় জ্ঞান ক'রতে পারি, হরলাল! জানি এ বর্তমান সমাজের ঘৃণা ও নিন্দা,—জানি এ খুব মর্মন্তুদ কিন্তু আমাদের কাছে তার মূল্য ত কিছুই নয়······শুধু হয়ত এতটুকু উপেক্ষা।

কাগজের কলটায় একটা বাঁশি বাজিয়া উঠে।

বাঁশির শব্দটা কানে আসিতেই হরলাল বলিয়া উঠেঃ ঐ শোন, সনৎ, কাগজের কলটায় বাঁশি বাজল। রাত এখন প্রায় দশটা। আজ সারারাত আমাদের অনেক কাজ। বস্তিতে খুব গোপনে ঘুরতে হবে। আজকাল আবার গুপ্তচরদের যে হিড়িক আর তা'ছাড়া সরদাররা বড় সজাগ।······ধর্মঘট তু'একদিনের মধ্যেই বাধানো চাই।

গঙ্গার তরঙ্গায়িত বুকের উপর ভাসিয়া উঠিল তার ধ্বনি একটি মুহূর্ত।

সাত

প্রতিদিনকার মত আজ আর বাজে না কারখানার বাঁশি, শোনা যায় না বয়লারের আওয়াজ আর ইঞ্জিন ঘরের গর্জন······

রবিবার······কলের ছুটি। সকাল হইতে কলের এলাকা একদম্ ফাঁকা।

মজুরের দল নানা রঙবেরঙের চুড়িদার পাঞ্জাবি পরিয়া, পানে মুখ লাল করিয়া বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে ঘুড়িয়া বেড়ায় রাস্তায়, বাজারে, মাঠে। সারা হপ্তায় একটা দিনের অবসর ইহারা উপভোগ করে মনে-প্রাণে, এদিন ইহাদের থাকে না প্রতিদিনকার দৈন্য······গ্লানি।

প্রখর রৌদ্রের তাপে রাস্তায় পিচ্ গলিয়া গিয়াছে······ লোহা-লক্কড়, ইট-সুরকীর শহরটা সূর্যের সবখানি গরম যেন নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে······মজুরদের কিন্তু শ্রান্তি নাই। কোথাও ইহারা তর্ক বাঁধাইয়া মাতিয়াছে, কোথাও ইহারা জুয়া লইয়া সোরগোল সুরু করিয়াছে আবার কোথাও ইহারা হয় মদের বোতল না হয় গাঁজার কলিকার চারিপাশে ভিড়িয়াছে। দিব্যি কাটে তাহাদের এই দিনটা।

* * * *

বাবুলাল এখন কলের বরখাস্ত···রাস্তায় রাস্তায় এখন পান ফেরি করিয়া বেড়ায়। টিনের একটা ডালি দড়ির সংযোগে

তাহার গলায় ঝোলে, খোপে খোপে তাহার পান, চূণ, সুপারি মশলা। কাগজে মুড়াইয়া মুড়াইয়া সে খিলি পান বিক্রী করে।

ছুটির দিন···বিক্রিও মন্দ হয় নাই কিন্তু এত গরমে পা আর চলে না। ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যাণ্ডের কাছে সহিস্‌রা ছায়ায় বেশ বিশ্রাম করে···বাবুলাল সেখানে আসিয়া ছায়ায় বসে। একটা একটা করিয়া এখানেও তাহার কয়েকটা খিলি কাটিয়া যায়।···

একেবারে সব শেষে যে গাড়িটা দাঁড়াইয়া ছিল তার পিছনের বসিবার জায়গাটায় সহিস্‌ গাড়িতে হেলান দিয়া ঝিমাইতেছিল। বাবুলালের বহুদিনকার আলাপী লোক সে, তাহার দিকে চোখ পাড়তেই বাবুলাল ভারি খুশি হইয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। পাশে বসিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার মাথাটায় নাড়া দিতে লাগিল। সহিসটি চোখ মেলিতেই বাবুলাল তাহার হাতে একটা পান দিয়া পা দোলাইয়া বুকের ডালাটা নাচাইতে নাচাইতে গান ধরিয়া উঠে। গানের সুরে সহিস-বন্ধুটির ঘুমটা টুটিয়া যায়, গানের একটা পদ বাবুলাল শেষ করিতেই সে সেই পদটার আবৃত্তি সুরু করিয়া দেয়। বাবুলালের বেশ আমোদ লাগিয়া যায়। সে আঙুলে টোক্‌কা দিয়া, বন্ধুর চোখে চোখ রাখিয়া এক একটা পদ বলিয়া যায় আর বন্ধু তাহাই আবৃত্তি করে। নিস্তব্ধ তুপুরে গাছের ছায়ায় বেশ জমিয়া যায় পানওয়ালার গান।

সহসা বাবুলালের গানের সুরটা কাটিয়া যায়। অদূরে একটা গুঁড়িতে হেলান দিয়া এতক্ষণ একটা সহিস একটা ছাপান কাগজের লিখিত বস্তু পাঠ করিবার জন্য মনোনিবেশসহকারে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিল কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে না পারিয়া সে বাবুলালের শরণাপন্ন হইল। বাবুলালের হাতে কাগজটা দিয়া সে বলিল ঃ বাবুলাল, এই তোরই পানের মোড়ক কিন্তু এতে সব কী লিখেছে দেখ দেখি একবার প'ড়ে! বাবুলাল কাগজটার উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলে ঃ কি হবে এসব কাগজ প'ড়ে, মোসলেম ভায়া! এ ফেলে দে। এ তোদের জন্য নয়।

সহিস তবু জিদ ধরিয়া বসে। সে বলে ঃ না হো'ক, তবু পড়, একবার।

বাবুলাল উত্তরে বলে ঃ রেগাল জুট মিলে যারা কাজ করে এ তাদের জন্যে। জানিস্ ত', কি রকম গোলমাল চল্‌ছে সেখানে। মাসানকে জোর ক'রে জেলে পাঠাল, আমাদের শুধু-শুধু বরখাস্ত ক'রল। হরতালের গন্ধ পেয়ে এর উপর আবার যা'তা সুরু করেছে। বস্তিতে বস্তিতে সব খবর রাখবার জন্য গুপ্তচর লাগিয়েছে, দল ভাঙবার জন্য সরদারদের চোখে আর ঘুম নেই আর এ ছাড়া মজুরদের দল বেঁধে গোপনে কথা বলা একদম বন্ধ। দারুণ জুলুম, তাই এই ইস্তাহার বল্‌ছে, মজদুর ভাই এক জোট হও,—সব তক্‌লীব খতম হবে, সুবিস্তা হবে……

মোসলেম সহিস বলিয়া উঠে: তাহ'লে বল্, এসব ইস্তেহার তোদেরই কীর্তি···এইতো, তোর ডালায় এম্‌নি কাগজ···

বাবুলালের হাসি আসিয়া পড়ে। হাসি দমন করিয়া সে বলে: চুপ্, মোস্‌লেম, ও কিছু না,—সব আমার পানের মোড়ক! মোসলেম এর কোন উত্তর না দিয়া নিজের জায়গায় চলিয়া যায়। বাবুলালের সহিস্-বন্ধুটি বাবুলালের সুরে গানের প্রথম পদটা আবৃত্তি করে আপনার মনে।

* * * *

বাবুলাল গুন্‌গুন্ সুরে গান করে আর বাসার পানে ফেরে। বড় রাস্তাটার মোড়টায় পৌঁছাইতেই দেখিতে পায় বিহারী তুই একটা যুবক ছোকরার সাথে হল্লা করিয়া বেড়ায়। বাবুলালকে দেখিতে পাইয়া বন্ধুদের বিদায় দিয়া সে তার কাছে ছুটিয়া আসে। পানের ডালাটার উপর হাত রাখিয়া সে চুপি চুপি বলে: খুব সাবধান, বাবুলাল।

বাবুলাল অস্ফুট উত্তর দেয়: কেন?

বিহারী উত্তর দেয়: ইস্তাহার কেমন ক'রে যেন সরদারদের হাতে পড়ে গিয়েছে। খুব খোঁজ চল্‌ছে। একটু আগে আমাদের ইউনিয়ন আপিস পুলিশ তল্লাসী করে গেল···

'কিছু পেল না কি!' বাবুলাল প্রশ্ন করে। বিহারী উত্তর দেয়: না, কিছু পায় নি। সব ত হরলালের জিম্মায়। সে পাওয়া ওদের বাপের ভাগ্যি।

বাবুলাল আপন মনে কি চিন্তা করে।

বিহারী আবার বলে ঃ জমিরের দল, মুহাম্মদের দল, আর উড়েরা কাল কলে যাবেই। এ দু'রাত সনৎ আর হরলাল তাদের খুব বুঝিয়েছে কিন্তু ওরা কোন কথাই শুনতে চায় না। মাঝখান থেকে খবরটি কলের সাহেবদের কানে চলে গেছে···

জনকয়েক মজুর এই পথে আসে। বাবুলাল ইসারায় বিহারীকে আসিতে বলিয়া তাহার হাতে একটা পান দেয়। বোটায় করিয়া চূণ দিতে দিতে সে নিজের বুলি স্বরু করে ; চাই পান, মিঠা পান···

লোকগুলো ইহাদের পাশ কাটিয়া যায়। একজন বাবুলালের হাতে একটা পয়সা আগাইয়া দেয়। বাবুলাল দুই খিলি পান দেয় কিন্তু এবার আর ইস্তাহারের মোড়ক দেয় না। লোকগুলো ইহাদের দৃষ্টির বাহিরে গেলে বাবুলাল বলে ঃ এরা যেন কেমন কেমন, এতটুকু আগ্রহ নেই···এতটুকু অনুভূতি নেই···

এ শালারা বিলাত আলির লোক···শালা একদম সাহেবের চর···বিহারী বলে।

আর ঐ জমির বেটা। আমাদের এতটুকু কথা সরদারদের কানে দেয়···বাবুলাল বলে। বিহারী উত্তর দেয় ঃ যাক্‌না এই ধর্মঘটের গোলমালটা, শালাদের একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দেব।

বাবুলাল বলে ঃ মাথা ঠাণ্ডা রাখ্‌ বিহারী ! কাজ পণ্ড হ'য়ে যাবে।

বাবুলালের কথায় বিহারী বলেঃ মাথা ঠাণ্ডা আর থাকে কই। ঐ শালারাই ত' সনৎ আর হরলালের খবরটা সাহেবদের কানে দিয়েছে···পুলিশ তাদের খোঁজ করছে কিন্তু পাচ্ছে না।···

বাবুলাল কথার মাঝখানে বলে : তাই নাকি? কাল তা হ'লে কেমন করে তোরা এক জোটে কল বন্ধ ক'রবি? বিহারী উত্তর দেয়ঃ ঠিক সময় তারা এসে পড়বে। তারা কি আর চুপ্ আছে? গোপনে গোপনে কাজ ঠিক সারছে। বাবুলাল কোন উত্তর আর দেয় না। আপন মনে পান-ওয়ালার গান গাহিতে গাহিতে সে অগ্রসর হয়।

বিহারীও চলিয়া যাইতেছিল কিন্তু সহসা কি যেন মনে হওয়ায় আবার বাবুলালকে গিয়া ধরে। চুপি চুপি কয়েকটা কথা তাহাকে বলে।

বাবুলাল ফিস্ ফিস্ করিয়া বলেঃ রাত্রে তা হ'লে দেখা হবে···ঐ আড্ডায়।

বিহারী উত্তর দেয়ঃ হ্যাঁ!

বাবুলাল আবার বলে : সব থাক্‌বে ত?

'হাঁ!' বিহারী উত্তর দেয়।

যে যাহার পথে চলিয়া যায়, বিহারী পথ চলিতে চলিতে আরও দুই একবার শুনিতে পায় পানওয়ালার বুলিঃ চাই পান, মিঠা পান।

* * * *

অপরাহ্নের দিকটায় দ্বিপ্রহরের তাপ একদম কমিয়া গিয়াছে ··সামান্য সামান্য মৃদুল হাওয়া বেশ আমেজময় হইয়া উঠিয়াছে···সারাদিন পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জঙলী একটি পয়সাও পায় নাই···খালি পেটে প্রখর রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার সার হইয়াছে দেহের কষ্ট।

চারিধারের দোকানে দোকানে ভোজ্য দ্রব্য রহিয়াছে··· একটা পয়সা ফেলিলেই যা-কিছু সে মুখে দিতে পারে কিন্তু কোথায় সে পয়সা। ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়া, পিচের রাস্তায় পা পুড়াইয়া অসহ্য গরম মাথায় সে সারাদিন ঘুরিল কিন্তু সে আদায় করিতে পারিল না মানুষের এতটুকু করুণা···

পোড়া পেট ক্ষুধায় কন্ কন্ করিয়া উঠে, খালি কলের জল খাইয়া ক্ষুধা মেটে না ঃ উপবাসী পাকস্থলীতে সেটুকু শুধু বমির উদ্গারের সৃষ্টি করে।

বৈকালিক হাওয়ায় ক্ষুধাটা সে যেন আবার অনুভব করে। যদিও সে মাঝে মাঝে কলের জলে ক্ষুধাটা নষ্ট করিয়া রাখে কিন্তু এ নিষ্ঠুর দানব হঠাৎ আবার উদরটার মধ্যে এমন নাড়া দিয়া উঠে যে রৌদ্র-পোড়া দেহখানাও তাহা উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না। ক্ষুধার ডাক এত গভীর···এত অনিবার্য।

সামনেই একটা জলের কল পড়িয়া যায়। দুই মুঠা ভরিয়া সে আপ্রাণ জল পান করিয়া লয়। গায়ে পাক দেয়···পথের ধারে ঘাসের উপর সে বসিয়া পড়ে।

কিন্তু এমন ভাবে বসিয়া থাকিলেতো আর ক্ষুধা মিটিবে না!

জঙলীর মনে হয় রোশেনালীর কথা...আজ দুই একটা পয়সা পাইলে কোন রকমে এখন তাহার চলিয়া যায়।

রোশেনালী এখন স্টেশনের বাহিরে মুটেগিরি করিয়া দুই একটা পয়সা যেমন রোজগার করে, তাহাতে চাচির সংসার এবং তাহার নিজের কোন প্রকারে চলে। সবে মাত্র একটা ঘোড়ার গাড়ি হইতে মোট নামাইয়া সে তাহা প্লাটফর্মে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় জঙলী সসংকোচে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

জঙলীর উপর চোখ পড়িতেই রোশেনালী বলিয়া উঠিল ঃ কীরে ?

জঙলী উত্তরে কাতরস্বরে বলিল ঃ একটা কথা আছে।

'দাঁড়া, মোটটা নামিয়ে আসি।' বলিয়া রোশেনালী প্লাটফর্মের দিকে চলিয়া যায়। জঙলী তাহার অপেক্ষায় ঐখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। রোশেনালী কাজ সারিয়া আসিয়া জঙলীকে ডাকিয়া বলে ঃ আয়।

জঙলী উত্তর দেয় ঃ কোথায় ?

'এখানে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌লে লোকে কত কি সন্দেহ ক'রতে পারে।' রোশেনালী বলে। রোশেনালী প্লাটফর্মের পাশ দিয়া রেল লাইনের ধারে ধারে চলিতে থাকে। যন্ত্র-পুত্তলিকার মত জঙলী তাহার পিছন পিছন চলে।

রেল লাইনের ঠিক ধারে একটা নির্জন জায়গায় আসিয়া একটা গাছের ছায়ায় রোশেনালী বসিয়া যায়, জঙলীও সেখানে

দাঁড়াইয়া পড়ে। রোশেনালী ইসারায় পাশের জায়গাটা দেখাইয়া বলে : বোস্।

জঙলী উত্তর দেয় : না।

রোশেনালী বলে : না, কেন ?

জঙলী বলে : আমি যার জন্যে এসেছি, তাই শোন। সেদিন তুমি যা দিয়েছিলে, তাতে ক'টা দিন একরকম কেটেছে। এই দুটো দিন আমার পেটে কিছুই প'ড়ে নি। আজ ক'টা পয়সা দাও।

রোশেনালী উত্তর দেয় : রোজ রোজ তোকে পয়সা দিলে আমার কি ক'রে চলবে, জঙলী। তুই আমার কি হস্ যে তোকেও আমার চালাতে হবে ?

মাথানিচু করিয়া জঙলী বলে : কিছু না হ'লেও এতদিন-কার একটা সুবাদে ত তোমার দেখা উচিত যে আমার পেটে দানা পড়ে !

'কিন্তু আমার আর তেমন উপায় নেই'। রোশেনালী বলে।

জঙলী উত্তর দেয় : তা জানি।' কিন্তু মাঝে মাঝে এক আধটা পয়সা না দিলে আমিই বা কি করি বলত ? তুমিই বল।

রোশেনালী কোন কথাই বলে না। ঘাসের উপর দৃষ্টিটা রাখিয়া সে বসিয়া থাকে।

জঙলী আবার সুরু করে : ক'দিন ভিক্ষে ক'রে বেড়ালাম কিন্তু ওতে একটা পয়সাও হয় না !

রোশেনালী বলে : কেন ?

জঙলী উত্তর দেয় : জোয়ান মেয়ে লোককে কেউ কি আর অম্‌নি অম্‌নি পয়সা দেয় ? লোক মনে করে এর এ ভিক্ষে এক ফন্দি। অসভ্য সব ইসারা করে…

এই পর্যন্ত বলিয়া ফেলিয়া জঙলী সহসা আপনা-আপনি থামিয়া পড়ে। মনে মনে ভাবে এ সব কথা ইহার কাছে তোলা হয়ত ঠিক হয় নি। চুপ করিয়া সে কাতরভাবে রোশেনালীর দিকে তাকাইয়া থাকে।

রোশেনালীর চোখে তাহার এ ভাবটা এড়ায় না। সে বলে : তাদের ইসারায় সায় দিলেই পারিস…

জঙলী বলিয়া উঠে : ধ্যাৎ, তাই কি হয়, রোশেন!

রোশেনালী বলে : কেন ?

জঙলী উত্তর দেয় : ক্ষিদেটা বড় তাত বুঝি, রোশেন, কিন্তু খিদের জন্য দশজনের ভোগ্যসামগ্রী হ'তে গেলে খিদেটা ঠিক মিট্‌তে চায় না।

সন্ধ্যার গোধূলির ছায়া চারিদিকে ততক্ষণ নামিয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যার মেলটা প্রচণ্ডগতিতে এদের পাশ দিয়া স্‌টেশনের দিকে ছুটিয়া গেল। জঙলী বলিয়া উঠিল : বড্ড খিদে, রোশেন! সারা দিনটা ঘুরেছি…যা হ'ক তুমি কিছু দাও। রোশেনালী বলে : আমিও, জঙলী, সারাদিন খেটেছি। এখনও চার আনা পয়সা হয় নি। তিনটি প্রাণীর এতে একটা বেলার খোরাকও হয় না…আমিও আর পারি না।

জঙলী চুপ্‌ করিয়া থাকে।

রোশেনালী হঠাৎ তাহার হাতটা ধরিয়া হেচ্‌কা টান মারিয়া বসে। জঙলী এই আকস্মিক আকর্ষণে তাহার শরীরের উপর পড়িয়া যায়। রোশেনালী তাহার সবল দুইখানি বাহুতে জঙলীকে জড়াইয়া ধরিয়া ঠোঁটের কাছে ঠোঁট লইয়া বলে ঃ আজকের এই সন্ধ্যেটা…

জঙলী দৃঢ়ভাবে বলে ঃ না।

রোশেনালী বলে ঃ হ্যাঁ, জঙলী!

জঙলী বলিয়া উঠে ঃ নাঃ—নাঃ—নাঃ। আমাকে ছেড়ে দাও।

জঙলী মুক্ত হইবার চেষ্টা করে কিন্তু রোশেনালী তাহাকে ছাড়িয়া দেয় না। সে বলে ঃ চেয়ে দেখ্‌, আমি রোশেন… তোর চিরদিনকার আলাপী লোক…এখন আমি তোর পর নই।

কিন্তু এ সব কিছু নয়…জঙলীর মাথায় ঘোরে একমুঠো ভাত…একখানা রুটি। জঙলী উত্তর দেয় ঃ কিছুতেই নয়।

রোশেনালী জঙলীকে ছাড়িয়া দেয়। জঙলী গায়ের কাপড়, মাথার চুল ঠিক করিয়া আবার তাহার সামনে গিয়া দাঁড়ায়, কাতর চোখে চাহিয়া থাকে।

রোশেনালী গাঁট হইতে তিন আনা পয়সা বাহির করিয়া বলে ঃ এই নে, আমার সারাদিনের রোজগারের পয়সা…আমার সামনে থেকে চলে যা…

ক্ষুধা…উদরের ক্ষুধা…শরীরের শিরায় উপশিরায় ডাকিয়া উঠে গভীরতম…দেহের ক্ষুধাও হার মানিয়া যায়।

আট

করিম খাঁর বাড়ীর আলো তখন নিবিয়া গিয়াছে। রাত্রের আহারাদি সমাপন করিয়া সকলেই ঘুমাইতেছে—কেবলমাত্র লতার চোখে তখন পর্যন্ত ঘুম আসে নাই। কিছুক্ষণ শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া যখন দেখিল পিতামাতা গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন সে সন্তর্পণে বিছানা ছাড়িয়া নিচের তলায় নামিয়া আসে। অন্ধকার নির্জন ঘরে একাকী বসিয়া থাকিয়া সে প্রহরের পর প্রহর গণিয়া যায় কিন্তু তবু তাহার চোখে ঘুম নাই, দেহে স্বস্তি নাই···একই ভাবে বসিয়া সময় কাটাইয়া দেয়।

জ্যোৎস্না-ভরা আকাশের ঠিক মাঝখানটায় তখন চাঁদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে···মধ্য রজনীর পূর্ণ নিরবতা চারিদিকে তখন বিরাজ করে···বিরাট কল-এলাকা আর মজুর বস্তি স্তিমিত জ্যোৎস্নার উত্তরীয় পরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।······

অন্ধকার ঘরে দেওয়ালের ঘড়ি শব্দ করিয়া রাত দুইটা বাজিল জানায়..লতার চাঞ্চল্য আবার বাড়িয়া যায়···ঠাঁই ছাড়িয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া চৌকাটের উপর দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে সে চাহিয়া থাকে অনেক্ষণ কিন্তু যাহার আশায় তাহার এ আকুল আক্ষেপ তাহার সন্ধান তখনও নাই।

দরজা ছাড়িয়া আবার সে ঘরে আসে। ছোট টেবিলটার উপর থার্মফ্লাস্কে চা ছিল, একটা পেয়ালায় খানিক ঢালিয়া

সে চুমুক দিতে থাকে। সহসা তাহার উৎসুক শ্রবণে আসিয়া পৌঁছায় কাহার যেন পায়ের শব্দ এবং সংগে সংগেই দরজায় টোকা পড়ে।

হাতের পেয়ালাটা তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর রাখিয়া লতা দরজা খুলিতেই সনৎ ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। পরচুলার বেশটা শরীর হইতে খসাইয়া ঘরের এককোনে ফেলিয়া সনৎ হাতের টর্চটা লতার মুখের উপর ধরে। মুখের উপর আলো পড়িতেই লতা সনতের হাত হইতে বাতি কাড়িয়া লইয়া নিজে সুইস্ টিপিয়া ধরিয়া বলে: নাও···আর দেরি ক'র না···ফ্লাস্কে চা আর ডিসে খাবার···তাড়াতাড়ি খাওয়াটা সার,···বোধ হয় সব ঠাণ্ডা হ'য়ে এল!

লতা খাবারের ডিস্ সনতের দিকে আগাইয়া দিয়া ফ্লাস্ক হইতে পেয়ালায় চা ঢালে। চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিতে দিতে সনৎ হাসি মুখে বলে: এতখানি রাত গা ঢাকা দিয়ে বস্তি বস্তি ঘোরায় পেট ও শরীরের যা অবস্থা তাতে এ খাবার লোভনীয় সন্দেহ নেই কিন্তু নিয়মিতভাবে এই খাবারটুকু জোগাড় করবার জন্য আজ আমাদের মজদুর ভাইরা কল-কারখানার দাস আর সেই দাসত্বের চাপে আজ এমন অবস্থায় তাদের আসতে হ'ল যাতে তাদের মাথায় ক'রে নিতে হচ্ছে অনাহার, লতা!

'কিন্তু তাতে কি তোমাদের অনুশোচনা, সনুদা?' লতা প্রশ্ন করে।

সনৎ উত্তর দেয়ঃ না—না—অনুশোচনা, মোটেই নয়,—শুধু আশংকা, ভয়, মায়া। পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়েই আমার কি মনে হ'চ্ছে জান, লতা ?

লতা আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করেঃ কী ?

—মনে হচ্ছে এই এত রাত পর্যন্তও হয়ত কারো কারো পেটে কলের জল ছাড়া আর কিছুই পড়ে নি। সনৎ উত্তর দেয়।

ধীরভাবে লতা বলেঃ অসম্ভব নয়…কিন্তু তারা মজতুর, মজতুরের ভাগ্যই এই !

—সত্যিই, তাদের ভাগ্য এই কিন্তু তার জন্য যদি তাদের না খেয়ে মরতেই হ'ল ভাগ্যের সমাধানে, তাদের কোমর বেঁধে লাগবার অবসর কোথায়, লতা ? সনৎ বলে।

চা পান সনতের তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া সে নির্বাক লতার দিকে অগ্রসর হইল। বাম হাতে লতার দেহখানা নিজের পাশে জড়াইয়া ধরিয়া সনৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলঃ চুপচাপ কেন ?…এ প্রশ্নের উত্তর কি তুমি জান না, লতা ?

লতার মুখ থেকে কোন কথাই বাহির হইয়া আসে না, শুধু সে ঘাড় নাড়াইয়া নিরবে জানায়ঃ না !

সনৎ আবার সুরু করেঃ করিম খাঁর কোঠা-বাড়ী আর গয়না-কাপড়ের মধ্যে থেকে তোমাকে ছিনিয়ে আনবার জন্য একদিন তুমি আমাকে ব'লেছিলে, না লতা ? সে কথা হয়ত

৫

আজও তুমি ভোল নি। আজ তার ভেতর থেকে তোমাকে বাইরে ডাক্‌ছে একা আমি নই,—সকল মজদুর। শুন্‌তে পাওনা তাদের আহ্বান,—শুন্‌তে পাওনা মিলের ফটকে ধর্মঘটীদের নিষ্ফলতার ব্যথা,—বুঝতে পারনা বস্তিতে বস্তিতে আগামী অনশনজ্বালার ভয়াবহ আশংকা?

লতা ধীরে ধীরে নিজের দেহখানা সনতের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়। সনৎ বাধা দেয় না, সে নিজের ডান হাতে তাহার একখানা হাত লইয়া কেবল নাড়াচাড়া করিতে থাকে।

লতা তাহার হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া বলে: কিন্তু তার কি কোন পরিবর্তনের লক্ষণ দেখেছ, সনু দা?

সনৎ উত্তর দেয়: না।

লতা বলে: তবে এ কথা বলার অর্থ?

সনৎ বলে: অর্থ কিছুই নয়...তোমাকে চাইলে আজ হয়ত পেতাম কিন্তু সে পাওয়ার কোন অর্থ নাই। তোমাদের এ সুখী সংসারের মাঝখানে আমার তোমার মিলিত একটি সংসার হয়ত ব'সতে পারত কিন্তু সেও কিছু নয়।

সংসারের চেয়ে আহারই আজ প্রয়োজনীয়, লতা, আর সেই আহারই আজ আমি তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি। তাই এ পাওয়া আজ আমার অনেক বড়।

লতা আনমনা ভাবে উত্তর দেয়: সংসারের চেয়ে আহার প্রয়োজনীয়, সনুদা?

সনৎ বলে ঃ হাঁ!

লতা বলিয়া যায় ঃ আমার কাছে তোমার সংসারের দাবি নয়……শুধুমাত্র আহারের ?……কিন্তু এত অনেক সোজা!

সনৎ উত্তর দেয় ঃ না সোজা নয়, লতা! কারণ একা আমার আহার নয়……আমার মধ্যে যে মজদুর কাঁদে ? এ তাদের সবার।

লতা হঠাৎ বলিয়া উঠে ঃ তুমি দাঁড়াও, সন্নুদা! আমি আস্‌ছি।

সনৎ একা-এক ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকে। অন্ধকার নিঝুম ঘরে শুধুমাত্র ঘড়িটার টিক্‌ টিক্‌ শব্দের সাথে রজনী পলে পলে কাটিয়া যায়। এমনভাবে চুপ্‌চাপ দাঁড়াইয়া থাকা রজনীর শ্রমক্লান্ত তাহার দেহখানা আর সহিতে পারে না। টেবিলটার উপরই সে শরীরটাকে এলাইয়া দেয়।

অনেকক্ষণ পর লতা যখন নিচে নামিয়া তাহার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়ায় তখন সনৎ তাহাকে সহসা চিনিয়া উঠিতে পারে না। শুধু গায় সামান্য একখানা কাপড় পরণে লতাকে সনৎ কোন-দিন পূর্বে দেখে নাই। সনতের পক্ষে তাই আশ্চর্য হওয়ারই কথা কিন্তু কোন প্রশ্ন করিতে যাওয়ার আগেই লতা কাপড়ের তলা হইতে একটা পুঁটুলি ও বাক্স সনতের কাছে আগাইয়া দিয়া বলে ঃ সন্নুদা, এই নাও আমার যথাসর্বস্ব…তোমাদের খাবার যথাসম্ভব…তুমি যাও এখন।

সনৎ তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করিয়া লতার হাতের জিনিষ-গুলি লয়। তারপর বলে : এখনই তুমি যেতে বলছ, লতা!

লতা উত্তরে বলে : হাঁ!

'—কিন্তু কেমন করে আমার যাওয়া হয়, লতা। এই রাত্রে বাইরে বেরুলে হয় গুণ্ডা আইনে পড়তে হবে, নয় ন' ধারার আসামী হ'তে হবে। আজকের রাতটায় তোমার এখানে আশ্রয়ভিক্ষা শুধু ত' এই জন্য।' সনৎ উত্তর দেয়।

লতা কোন উত্তর না দিয়া উপর তলায় চলিয়া যাইতে অগ্রসর হয়।

সনৎ ডাকে : শোন, লতা!

লতা পিছনে ফিরিয়া উত্তর দেয় : কী?

"—আমি চলে যাচ্ছি, লতা! তুমি দরজা বন্ধ ক'রে দাও কিন্তু হয়ত আবার এক-আধদিন আমাদের কাজের জন্য তোমার চৌকাঠে পা দিতে হবে···সেদিনও যদি এম্‌নি ভাবে বিদায় দিতে চাও তা কিন্তু আমি শুন্‌ব না, লতা!"

লতা মুহূর্তের মধ্যে যেন কেমন হইয়া যায়। অপরিসীম গাম্ভীর্যের সাথে সে ডাকিয়া উঠে : সনুদা!

সনৎ উত্তর দেয় : আজ আর আমি শুধু তোমার সনুদা নই—শুধু মজদুর, দুনিয়ার হতভাগা মজদুর।

সনৎ যখন পথের উপর পা দিয়াছে তখন তার পিছনে কেবল বাজিয়া উঠিল দরজা-ভেজানোর ঝনাৎ শব্দ!

* * * *

বিরাট লৌহ-ফটকের তলায় মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে মানুষের আকুল আবেদন, কিন্তু ব্যর্থ…ব্যর্থ! মানুষের শ্রম তার ন্যায্য পাওনা পায় নাই কোনদিন এর ভ্রুকুটির ঔদ্ধত্যে, দুনিয়া গড়িবার জন্য যাহাদের জন্ম এ দুনিয়ায় তাহারা হার মানিয়া যায় এর একটি ঝনাৎ শব্দে…এত নির্মম, এত ক্রুর এ লৌহ-ফটক।

এর নির্দয় অত্যাচারের ইতিহাস—সে এক দিনের নয়… একটা জাতির নয়…একটা দেশের নয়…সে যুগ যুগ ধরিয়া সারা দুনিয়ায় দীর্ঘ আয়তন বাড়াইয়াই চলিয়াছে। এর পাতার তলে তলে রক্তাক্ত রবিবার, ইংল্যাণ্ডের কয়লার খনির অন্তরালে বেত্রাহত শিশু মজুরদের শোণিত…কুলিমেয়েদের নির্লজ্জ দেহদান মুখ লুকাইয়া এখনও পড়িয়া রহিয়াছে… তাহাদের কান্নার দাগ শুকাইতে চায় না এর পাতায় পাতায়… নবরূপে নব ভাবে আবার জাগিয়া উঠে আজিকার দুনিয়ায়।

…প্রতিদিনকার মত আজও কলের বাঁশি বাজিয়া উঠে… লৌহ-ফটকটাও খুলিয়া পড়ে কিন্তু কলের কাজ আজও হয় না। দলে দলে মজুরদের কলে প্রবেশ করিবার হুড়-হাঙ্গামা নাই…যাহাদের কারখানায় যাইবার আগ্রহ, তাহাদেরও ঢুকিবার খুব সহজ উপায় নাই।…ইউনিয়নের কর্মীরা পথ আগলাইয়া পড়িয়া আছে…অনুরোধ-উপরোধ দ্বারা আজ তাহারা সবাইকে কলের কাজ বন্ধ করাইতে প্রয়াস পায়…

* * * *

প্রখর রৌদ্রে পিচগলা রাস্তাটার উপর পড়িয়া ধর্মঘটীর দল আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে কিন্তু পূর্ণ ধর্মঘট আর হয় না। হরলাল, সনৎ, বিহারী প্রভৃতির কয়দিনকার আয়োজনে যদিও অধিকাংশ শ্রমিক কারখানায় অনুপস্থিত হয় কিন্তু বিলাত আলি প্রভৃতির দলের লোক ইহাদের কথা শুনিতে চাহে না। সহ-কর্মীদের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া কারখানার কর্তাদের সাথে যাহারা একজোট হয় তাহাদের অনেকেই সরদারের হাতের লোক আর তা ছাড়া ইহাদের অনেকেই ইউনিয়নের প্রতি বিমুখ। সহকর্মীদের এবংবিধ আচরণ ধর্মঘটীদের দমায় না, তাহাদের অনুরোধ আর উপরোধ ব্যস্ত করিয়া তোলে কারখানার লৌহ-ফটক!

* * * *

কারখানার ছুটির পর বস্তিতে ফিরে মজুরের দল··· কলের ফটকের সাম্‌নে যে সংঘর্ষ সারাদিন চলিল ধর্মঘটী আর কারখানায় যোগদানকারী মজুরদের, এখানে এখন তার নাই একটি চিহ্ন—শুধু বস্তির এক-একটা আড্ডায় কথোপকথন আর আলোচনায় চলিয়াছে তারই রোমন্থন—

এক এক করিয়া বস্তির ঘরে ঘরে আলো নিবিয়া পড়ে—কোলাহলময় বস্তির এলাকায় একটা নিরব নিস্তব্ধতা ভাসিয়া উঠে—মজুরদের ব্যথা উল্লাস, হর্ষ বিষাদ ঘুমাইয়া পড়ে নিশীথ রাতের নিস্তব্ধ ছায়ায়, শ্রান্তির এই অলস অবকাশে এই অল্পক্ষণ!

অন্ধকার রজনী—টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নাই প্রকৃতির গায়—বস্তির নিরব প্রান্তরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার কাতরানি কেবল শোনা যায়—

তিন দিন মজুররা কারখানার কাজ বন্ধ করিয়াছে—গত হপ্তার রোজগার যা-কিছু হাতে ছিল্ প্রায় সব শেষ হইয়া আসিয়াছে—আগামী মূর্ত অনশন হাঁ করিয়া ইহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আর একদিন দুইদিন—তারপর কি করিয়া পেটের দানা আসিবে সে চিন্তা ধর্মঘটের মাঝখানে না আসিলেও তন্দ্রাঘোরাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে মাঝে মাঝে আসিয়া পড়ে।

রাত্রি শেষ হয় নাই···প্রায় একদণ্ড বাকি! ভোরের আব্ছা অন্ধকার ফুটিয়া উঠিবার মত···বস্তির কুঠরিতে কুঠরিতে নিদ্রাশেষের ক্ষীণ আওয়াজ এদিক-ওদিক জাগিয়া উঠে···শেষ রাত!

হরলাল, সনৎ আর আর ধর্মঘটের নেতারা বহুক্ষণ রাস্তায় বাহির হইয়াছে। কলের বাঁশি বাজিয়া উঠিবার আগেই দিনের ধর্মঘট চালনার সর্ববিধ ব্যবস্থা তাহাদের করিতে হয়। বস্তির ভিতর যখন তাহারা আসিয়া পড়ে তখন কোন জনপ্রাণীর ঘুম ভাংগে নাই। ইহাদের আগমনে একে একে সবাই উঠে কিন্তু কেন যেন সবারই মনে অবসাদ···মন যেন তাহাদের চায় না এ সংগ্রাম অথচ যাওয়ার উল্লাসও এতটুকু কম নাই।

ইহাদের হাঁকডাকে সব সাজিয়া গুজিয়া উঠে কিন্তু চলার

শক্তি যেন তাহাদের নাই···উন্মাদনা নাই···মন ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠে না।

মজদুর ইহারা···দুনিয়ার হতভাগা···অত্যাচারিত, প্রপীড়িত অনশনক্লিষ্ট। বিপ্লবের অগ্নিশিখা তাহাদের পাঁজরে পাঁজরে জ্বলে কিন্তু তবু তারা পুরাদস্তুর বিপ্লবী নয়···খাঁটি কমরেড এখনও তাহারা হইয়া উঠিতে পারে নাই···তাহাদের শক্ত কব্জিতে তাই এ মাটির উপর মজদুর-সমাজ আসন গাড়িয়া বসে না এখনও।

এক এক বস্তির ধর্মঘটী মজুররা ইহাদের আহ্বানে একে একে বাহির হইয়া আসে। মনে প্রাণে তাহাদের অবসাদ কিন্তু দেহে জাগে উত্তেজনা। ঐ কারখানার অন্তরালে তাহারা দিনের পর দিন খাটিয়াছে আর তারই লৌহ-ফটকের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া এখন তাহাদের মাথা খুঁড়িতে হইবে: ওগো ভাই, কলের কাজে কেউ তোমরা আর যেয়ো না। ওখানে আমরা পাই নি ন্যায় বিচার, পেয়েছি অত্যাচার নির্মম···নিদারুণ।

ওয়াহেদালী বৃদ্ধ মজুর···ছোট ছেলেটা তার লুংগি ধরিয়া পিছন হইতে টানাটানি করে। তাড়া খাইয়াও সে সরিয়া যায় না, বলে: বাপজী, টিফিনে আসবার সময় এক পয়সার জিলাপী আনিস্।

ছেলেটার হাতটা ছাড়াইয়া ঠেলিয়া দিয়া ওয়াহেদালী চেঁচাইয়া উঠে: ভাগ্, জিলাপী খাবে? দুদিন বাদে খাবি কেবল কলের পানি!

ছেলেটা ধাক্কা খাইয়া কাঁদিয়া উঠে। দাওয়া হইতে মা এ দৃশ্য দেখিয়া ছেলেটাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠে: আন্‌তে পারবি না,—আনিস্ না! তা আবার বকুনি কেন!

ওয়াহেদালী সনতের কাছে আগাইয়া আসিয়া বলে: এই সনৎ, দিনের পর দিন আমাদের কোথায় তোরা টেনে নিয়ে যাচ্ছিস্, দেখছিস্ ত! পিছনে দেখ্ আমাদের ছেলেমেয়ে পরিবার, পেটের দানা আর পরণের কাপড়!

সনৎ চারিদিক চাহিয়া উত্তর দেয়: ভয় নাই!

ওয়াহেদালীর কথা শেষ হইবার সংগে সংগেই দলের মধ্য থেকে গুঞ্জন সুরু হয়: হাঁ, হাঁ,—আমাদের ছেলেমেয়ে, পরিবার, পেটের দানা আর পরণের কাপড়!

বজ্রগম্ভীরস্বরে হরলাল চিৎকার করিয়া উঠে: চুপ্,—বল মজদুর জিন্দাবাদ।

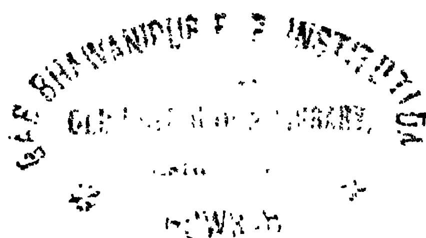
হরলালের চারিপাশে ছোক্‌রা মজুরদের কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠে:

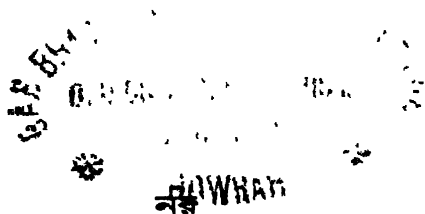
মজদুর জিন্দাবাদ!

* * * *

ধর্মঘট,—এ শুধু সামান্য দাবি-দাওয়ার সংগ্রাম নয়... একটা অসন্তোষ মোচনের প্রয়াস নয়...যুগ যুগ ধরিয়া হাজার হাজার মানুষ যে অবিচার পাইয়া আসে এ তারই এক-একটার প্রকাশ। এই প্রকাশ-ভংগির মধ্য দিয়াই জাগিয়া

উঠে বিপ্লবের অগ্নিশিখা—যার প্রবাহের জন্য কোনদিন কোন যুগে কোন ভগীরথের প্রয়োজন হয় না, শত শত অন্যায়ের মধ্যে মানুষের বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া এ ছড়াইয়া পড়ে চারিদিক······অটুট রাষ্ট্রও যার জন্য একদিন টলমল করিয়া উঠে।





প্রভাতের আলোর সাথে সাথে বস্তিতে জাগে চাঞ্চল্য···

কারখানার কর্তাদের হুকুমে প্রহরীরা বস্তিতে জমায়েত হয়। যাহারা যাহারা ধর্মঘটে যোগদান করিয়াছে বস্তির কুঠরি ছাড়িয়া এখনি অন্যত্র তাহাদের চলিয়া যাইতে হইবে। এতদিন ধরিয়া কত যত্নে গড়া সাধের সংসার ভাঙিয়া, পুত্র পরিবারের হাত ধরিয়া তাহাদের চলিয়া যাইতে হইবে, কোথায় তার ঠিকানা নাই! এ কথা যাহাদের বুকে বাজিল তাহারাই জানিল। অন্যে তাহার কি বুঝিবে?

উদরের অন্নের সংস্থানের উপায় তাহারা নিজেরাই নষ্ট করিল, মাথা গুঁজিবার এতটুকু স্থান আজ তাহাদের রহিল না, ছেলে মেয়ে সংসার লইয়া এ অঞ্চলের একটা গাছের তলায় দাঁড়াইবার বুঝি আজ তাহাদের স্থান নাই কিন্তু কেন তাহাদের মাথার উপর ভাগ্যের এত পরিহাস? শ্রম-শক্তির বিনিময়ে ন্যায্য পাওনা আদায় করিবার এ যুদ্ধ নির্মম শমনের মত উপেক্ষা করিতে চায় অর্থশালী বণিকের দল। যাহাদের টাকার ঝন্‌ঝন্ শব্দের সাথে ঝরিয়া পড়ে এক-একটা মানুষের বুকের রক্ত······চোখের জল! তবু কি আর তাহারা এ হতভাগা মানুষদের পানে ফিরিয়া চায়!

প্রহরীর রুল আর ভ্রূকুটির ভয়ে এক এক করিয়া মজুররা বাহির হইয়া আসে। সংগে সংগে ছেলে মেয়ে, পরিবার,

ঠোলামালা, হাঁড়িকুঁড়ি, বিছানাপত্তর হাতে করিয়া তাহারা বাহির হয়। চোখে মুখে ইহাদের ত্রাস, আশংকা, ভয়, তবু এ ঘর, এ বাড়ী তাহাদের ছাড়িতে হয়।

এক এক করিয়া কারখানার বাঁশি সব বাজিয়া যায়।

কলের লোকেরা কাজে বাহির হইয়া যায়। দূরে কারখানার ফটকে ধর্মঘটীদের সোরগোল শোনা যায়।

বাহিরে মানুষের আর্তনাদ, ভিতরে বয়লারের গর্জন মিশিয়া অদ্ভুত শব্দের সৃষ্টি করে।

প্রহরীদের সাথে কয়েকজন যুবক শ্রমিক ঝগড়া বাধাইয়া তোলে। তাহারা ঘর ছাড়িতে চায় না কিন্তু তাহাদের কথা শোনে না প্রহরী। তাহারা জোর করিয়া ঘরগুলিতে ঢুকিয়া পড়ে......ঘরের জিনিষপত্তর টানিয়া বাহির করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়.........তারপর রুলের গুঁতোয় ঘরের ছেলে মেয়েদের বাহির করিয়া দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দেয়। প্রপীড়িত অজ্ঞান শিশুদের আর অসহায়া নারীদের আর্তনাদে বস্তি কাঁপিয়া উঠে।

সমবেত জনতার মধ্য হইতে উত্থিত হয় ধ্বনি: ঘর আমরা কেউ ছাড়ব না। আমরা মজুর,—দুবেলা ভাত, মাথা গুঁজবার জায়গা, এ আমাদের পাওনা।

উৎপীড়িত মানুষের কণ্ঠধ্বনি শুধু বাতাসে মিশিয়া গেল। প্রহরীদের উদ্যত রুলের আস্ফালনে কণ্ঠ ইহাদের নিরব হয়।

সংবাদ পাইয়া ধর্ম্মঘটীরা কারখানার ফটক ছাড়িয়া বস্তিতে আসিয়া পড়ে। অত্যাচারের হাত হইতে ছেলেমেয়েদের বাঁচাইবার জন্য তাহারা প্রহরীদের সাম্‌নে গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে। উদ্যত রুলের আঘাত তাহাদের ঘাড়ে গিয়া পৌঁছায়!

বস্তির প্রান্তরে মজুররা সব ছেলেমেয়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বিরাট ঝড়ের পরে ঝরা পাতা, ভাঙা ডালের মাঝখানে উৎপীড়িত গাছগুলি যেমন দাঁড়াইয়া থাকে এও যেন তেমনি।

তাহাদের মুখের দিকে চাওয়া যায় না,—এক-একটা মানুষ যেন এক একটা অসহায়তার প্রতীক!

মোটঘাট লইয়া ছেলেমেয়েদের হাত ধরিয়া মজুররা চলিয়াছে,—ঝড়ের পর ঝড়ো পাখীর মতন আশ্রয়-হারা।

প্রহরীদের সাথে ধর্ম্মঘটীদের বচসার সীমা নাই, কিন্তু বচসা করিয়া কোন লাভ নাই। বস্তি ছাড়িবার হুকুম যখন হইয়াছে, তখন এ বস্তির আশ্রয় ইহাদের ভাঙিয়াছে। বচসা করিয়া যুক্তি দেখাইয়া, অনুরোধ জানাইয়াও এ রদ করা যায় না।

অকস্মাৎ খান দুই ভাঙা টালি আসিয়া প্রহরীদের ঘাড়ের উপর পড়ে। কোথা হইতে এই টালি আসিয়া পড়ে তার সন্ধান না করিয়া প্রহরীরা একধার হইতে ধর্ম্মঘটী মজুরদের পিটাইতে সুরু করে। এই অহেতুক অত্যাচারে কয়েকজন শ্রমিক মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে না,—অন্যায় আঘাত হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্য তাহাদের সহিত প্রহরীদের

হাতাহাতি বাধিয়া যায়। একে ত আশ্রয়হারা, অনশনক্লিষ্ট, তার উপর প্রহরীদের অহেতুক উষ্মা উৎপীড়িত মজুররা আর সহিতে পারে না। দুর্বল হাত তাহাদের উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠে, হাতের কাছে যে যাহা পায় তাহা লইয়াই তাহারা প্রহরীদের আক্রমণ করে। এই দাংগায় কাহারও হাত কাটে, মাথা ফাটে, নাক ছিঁড়িয়া যায়, প্রহরীরা পলাইয়া গিয়া কারখানায় খবর দেয়।

ইতিমধ্যে মজুররা দুই একজন পলাইয়াছে, আর সবাই পালাইবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় বস্তির চারিধার ঘিরিয়া দাঁড়াইল থানার পুলিশ! আবার কোথা হইতে টালি পড়ে। পুলিশ ক্ষেপিয়া গিয়া মজুরদের উপর উৎপীড়ন সুরু করে কিন্তু নির্দোষ মজুরদের মধ্যে কেউ বুঝিতে পারে না কাহার এই কাজ। অথচ পুলিশের অত্যাচার থামিতে চায় না। সহসা আর একখানা টালি আসিয়া পড়িতেই মজুররা দেখিতে পায় বস্তির লাইনের কোন্‌টায় আর একখানা টালি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে বাহাদুর,—একজন মজুর।

অত্যাচারিত মজুররা চিৎকার করিয়া উঠেঃ আমাদের মারছ কেন! টালি ছুড়েছে ঐ শালা বাহাদুর,—শালা চর!

মুহূর্তের মধ্যে বাহাদুর কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায় কাহারও দৃষ্টি তাহা অনুধাবন করিতে পারে না। পুলিশ বাছা-বাছা কয়েকজন মজুরকে হাতকড়ি, পিঠ-মোড়া দিয়া কারখানায় লইয়া যায়। কল-এলাকার বস্তির মজুররা এদিক ওদিক

ছত্রভংগ হইয়া পড়ে—অতবড় বস্তিখানা যেন এখন একটা শ্মশানের মত।

কলিকাতায় ইউনিয়নের কার্যসংক্রান্ত ব্যাপার সমাধা করিয়া সনৎ বিহারীর সংগে সন্ধ্যায় ইউনিয়ন অফিসে পৌঁছাইল। পৌঁছিয়াই সকালের ঘটনাটা সবিস্তারে শুনিতে পাইল। বুঝিতে পারিল যে ব্যাপারটা খুব খারাপভাবে গড়াইয়া গিয়াছে,—অন্তত মজুরদের স্বার্থের পক্ষে দাংগা হাংগামা মোটেই অনুকূল নয়। সে কালবিলম্ব না করিয়া সন্ধ্যার স্তিমিত অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া বস্তির পানে চলিল।

সারা বস্তিটা শূন্য খাঁ খাঁ করিতেছে। ঘরের পর ঘর খালি পড়িয়া আছে,—প্রাংগনে এখনও সেই বহিষ্কৃত শ্রমিকদের ভাংগা সংসারের দুই একটা চিহ্ন বর্তমান। বাকি ঘরগুলিতে মিটিমিটি আলো জ্বলিতেছে, ছোট সংসারের গুঞ্জন শোনা যায়···যাহারা ধর্মঘটে যোগদান করে নাই তাহাদের এ সব ঘর·········

বস্তি ছাড়িয়া সনৎ বাহির হইল। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই সে বুঝিতে পারিল যেন কাহারা তাহার পিছন ধরিয়াছে। যতদূর যায় তত দূর ছায়ার মত যেন তাহারা আসিতেছে। বড় রাস্তাটার মোড়টায় যখন সে আসিয়া পড়িল তখন সে পিছনে চাহিয়া দেখে এখনও তাহাদের দেখা যায়। আর কালবিলম্ব না করিয়া পার্শ্ববর্তী ইটখোলার মাঠটার মধ্যে সে নামিয়া পড়িল। দূরে নর নারীর কোলাহল

শুনিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় বহিষ্কৃত মজুররা আস্তানা পাতিয়াছে সেথায়।

*　　*　　*　　*

বিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর রেল লাইনের ধারে ধারে মজুররা আড্ডা গাড়িয়াছে। সবুজ ঘাসের পর প্রশান্ত আকাশের তলে সর্বহারা শ্রমিকদের আজ ঘর বাড়ী সংসার। বস্তির কুঠরিতে যে ব্যবধানটুকু ছিল আজ তাহা মিটিয়া গিয়াছে,—ভাগ্যের একই উপহাস আজ তাহাদের উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপ তলে দিয়াছে আশ্রয়, যেখানে সামান্য একটু দেওয়ালেরও অন্তরাল নাই,—মজুর জগতে আজ ইহারা যেন একটি বিরাট পরিবার।

মাটির উপর ইট পাতিয়া মেয়েছেলেরা রান্না চড়াইয়াছে,—ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মোট ঘাটের উপর চড়িয়া খেলা করিতেছে,—পুরুষরা সব একটা জায়গায় জড় হইয়া কেরোসিন ল্যাম্পের তলায় গল্প বসে···কারখানার কথা, ধর্মঘটের কথা, নিজেদের সমস্যার কথা।

সনতের আবির্ভাবে মজুরদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। আড্ডার মাতব্বর গোছের লোকরা সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল দাংগা হাংগামার কথা, প্রহরী আর পুলিশের সহিত সংঘর্ষ, গুপ্তচরের লীলা আর নির্দোষ মজুরদের আটক।

সনতের মনে ভাসিয়া উঠিল দারুণ সংশয়। শ্রমিকদের বর্তমান সংগ্রামে যে পরিস্থিতি আসিয়া পড়িল তাহার

পরিণতি যে কত দূর তাহা সে সম্যক্ অনুধাবন করিল অথচ শ্রমিক-সমস্যায় দাংগা হাংগামা যে এড়াইয়া চলা দায় তাহা জানা থাকিলেও তাহাদের এ আন্দোলনে এমনতর একটা অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। যখন তার আবির্ভাব হইল তখন যেমন করিয়াই হউক সে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, একজোটে সকল মজুরকে যুঝিতে হইবে মজুরদের স্বার্থ লইয়া......সফল করিয়া তুলিতে হইবে সকল মজুরদের ব্যথা ও বঞ্চনা।

দশ

সন্ধ্যার দিকটায় কল-এলাকার রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায় শুধু পুলিশের দল। লাল পাগড়ী মাথায় এবং লাঠি হাতে তাহারা রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাহারা দেয়। কারখানার সামনেও অমনতর অগণিত গুর্খা সৈন্য রাইফেল হাতে খাড়া রহিয়াছে। সেদিন বস্তিতে পুলিশ ও শ্রমিকদের যে সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে তারই ফলে কলের কর্তাদের আবেদনে স্থানীয় পুলিশসাহেব এই শান্তিরক্ষক সৈন্য মোতায়েন করিয়াছে।

* * * *

সন্ধ্যায় ইউনিয়ন আপিসে সেদিন সভা হইবে পূর্ব হইতে স্থিরীকৃত ছিল। এদিনকার বিষয় ছিল সেদিনকার স্থানীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে কলিকাতার মজতুর নেতাদের সহিত সনতের যে সব আলোচনা ও পরামর্শ হইয়াছে অন্যান্য কম্‌রেডদের তাহা অবগত করান এবং আজিকার দিনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা। এ ছাড়া দাংগা-হাংগামা ব্যাপারের জন্য যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তার গুরুত্বও আজ কম নয়; কারণ এখন ইহা আর কেবলমাত্র স্থানীয় সমস্যা নয়। সংবাদপত্রের মারফৎ ইহা আজ জনসাধারণের কর্ণ-গোচর হইয়াছে এবং সমাজ-তন্ত্রী সংবাদপত্রগুলি ইহা লইয়া এইরূপ আলোচনা সুরু করিয়াছে যে ইহা আজ শুধু সমাজ-তন্ত্রী নেতাদের নয়, কংগ্রেস-নেতাদের দৃষ্টিও আকর্ষণ

করিয়াছে। বুভুক্ষিত, প্রপীড়িত আশ্রয়হীনদের দুর্দশার কাহিনী দেশের দ্বারে দ্বারে গিয়া পৌঁছিয়াছে,—সমাজ-তন্ত্রীদের আদর্শের সাথে কংগ্রেসের আদর্শের পার্থক্য থাকিলেও যেহেতু সমাজ-তন্ত্রিগণ সর্বভারতীয় একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের আওতায় কাজ করে সেইহেতু আজ এই শ্রমিকের ব্যথা অধিকার করিয়াছে দেশের সর্ববিধ মতবাদীর মন! এ সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য সকলেই সংঘবদ্ধ হইয়াছে। যথাসময়েই ইউনিয়নের সভ্য ও কর্মীরা একে একে আপিস-গৃহের কাছে হাজির হইল কিন্তু তাহারা আর একপাও অগ্রসর হইতে পারিল না; কারণ তাহারা সেখানকার লোকদের কাছে শুনিতে পাইল পুলিশ কিছুক্ষণ আগে আসিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া দিয়াছে। অদ্যকার সভায় সনৎ একা আসে নাই সংগে লতাও আসিয়াছিল। সে তখন কোন গুপ্ত নিরাপদ স্থানে যাইয়া সভা করাই শ্রেয় মনে করিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সকলকে লইয়া অগ্রসর হইল।

কয়েক পদ আসার পর তাহারা শহরের সদর এলাকায় আসিয়া দেখিল রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ পাহারা। একে ত ইহাদের কয়েক জনের উপর কারখানার গুপ্তচরদের সতর্ক দৃষ্টি আর তাহা ছাড়া পুলিশ এখন সেদিন ইট পাটকেল পড়ার জন্য সন্দেহজনক মজুরদের দায়ী করিয়া তাহাদের উপর মামলা খাড়া করাইতে চায়। পুলিশের চক্ষু এড়াইবার জন্য সনৎ ও তাহার সংগিগণ ছত্রভংগ হইয়া স্টেশনের দিকে চলিল।

সনতের সংগে কেবল লতাই রহিল আর সবাই আলাদা আলাদা পথে রওনা হইল।

ঠিক সন্ধ্যার পর চারিদিকে অন্ধকারের স্বচ্ছ ছায়া নামিয়াছে। সাবধানে ইহারা দুইজন চলে পাছে কোন প্রকারে কোন গুপ্তচরের সন্ধানে পড়িয়া যায়—যে রকম চারিদিকে পুলিশের ভিড় তাহা হইলে তাহাদের রক্ষা পাওয়া দায়।

খানিক চলিবার পর লতা কথা বলে : বস্তির মজুররা যে দিকটায় আড্ডা গেড়েছে সেদিকটায় আমাকে নিয়ে চল, সন্তুদা। তাদের অবস্থাটা একবার দেখে আসি।

সনৎ নিরবেই পথ চলে। লতার বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া সে বলে : না, সে পথে আমার যাওয়া চলে না, লতা। সে এলাকায় নিশ্চয় এক আধটা গুপ্তচর আছে।

লতার এতখানি আগ্রহ বিফল হওয়ায় সে নিরুৎসাহ হইল বটে কিন্তু সে এতটুকু ব্যথা পাইল না ; কারণ সে পথে সনতের বিপদের সম্ভাবনা। সনৎ যদিও লতার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিল না তবুও সে মুখে মুখে তাহাদের বর্তমান দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল। লতার করুণ হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া পড়ে……চোখে তাহার জল আসে।

পথ চলিতে চলিতে তাহারা স্টেশনের প্লাটফর্মে আসিয়া পড়ে। অন্যান্য দিক হইতে আর আর সভ্যেরাও একে একে আসিয়া পড়ে। এখান হইতে একজোট হইয়া এখন তাহাদের অন্য নিরাপদ জায়গায় যাওয়া চাই।

সনৎ সবাইকে সেখানে দাঁড়াইতে বলিয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে ঘোড়ার গাড়ির স্ট্যাণ্ডের কাছে যায়। চারিদিক চাহিয়া সে যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সহসা অল্পদূরে এক পানওয়ালার সংগে তাহার চোখাচোখি হয়,—সে হাঁকিয়া উঠে : চাই পান,—মিঠা পান!

সনৎ তাড়াতাড়ি তাহার নিকট হাজির হয়। একটি পয়সা তাহার ডালার উপর ফেলিয়া দিয়া সে বলে : পান,—এক পয়সার।

পানওয়ালা ডালার উপর মুখ রাখিয়া পান সাজিয়া যায়। তাহার ডালার উপর টোকা মারিয়া সনৎ বলে : কোন খবর আছে, বাবুলাল?

পানের ডালার উপর চোখ রাখিয়াই বাবুলাল বলে : চর আনাচে-কানাচে।

সনৎ আবার বলে : আর সেই.........।

বাবুলাল পানটা মুড়িতে মুড়িতে বলে : অজয়বাবু টাকা দেবে হাজার দুই......কাল-পরশু লতার বাসায়। সাবধান!

বাবুলালের হাতের পান মুখের ভিতর দিয়া সনৎ বলে : আমরা সভা ক'রতে যাচ্ছি লাইনের পারের সেই বনের পুকুর ধারটায়। আফিসে পুলিশ তালা মেরেছে। পুলিশ কিংবা চর যদি সন্ধান পেয়ে ধাওয়া করে তবে খুব হুঁশিয়ারভাবে খবর দেওয়া চাই।

পানওয়ালা আবার হাঁক ধরে : চাই পান, মিঠা পান।

এগার

আম কাঁঠাল বাঁশবনের ঘন ছায়ায় অতি প্রাচীন পুষ্করিণীর পাড়ে কম্‌রেডরা মন্ত্রণায় নিমগ্ন। বাহিরের কোন গোলমাল এখানে প্রবেশ করিবার পথ পায় না—বিরাট নিঝুম স্তব্ধতার অন্তরালে কথা বলে চির নির্যাতিত মানুষের মুক্ত আর্তনাদ……

অনশনক্লিষ্ট, নিরাশ্রয়, কর্মচ্যুত মজুররা আজ যে অবস্থায় পড়িয়াছে, তাহাতে অবিলম্বে অর্থ সাহায্য না পাইলে তাহারা এক এক করিয়া যে অনাহারে মরিতে থাকিবে, তাহা আজ সবাই বুঝিতে পারে। এই সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল এই। সমস্ত কমরেডদের সনৎ জানাইল: আমাদের এ ধর্মঘটকে সফল করবার জন্য কংগ্রেস কর্মীরা প্রস্তুত হচ্ছে।

সকল সভ্য সনতের মুখে নেতাদের সংকল্প শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে তাহাদের কলের নিরপরাধ শ্রমিকদের উপর পর পর যে বে-আইনী আটক ও অন্যায় অত্যাচার চলিতেছে তাহার কাহিনী দেশবাসীদের মন বিচলিত করিয়াছে। সমবেত কমরেডদের পক্ষে ইহা বিশেষ আনন্দজনক হইল। তাহাদের সকলের কণ্ঠে একসংগে উচ্চারিত হইল "মজদুর জিন্দাবাদ!"

সমবেত মজুরদের সনৎ আরো জানাইল যে অবিলম্বে কলের কর্তাদের নিকট তাহাদের দাবিগুলি পেশ করা হইবে

এবং সেগুলি মিলের মালিক যতদিন না স্বীকার করে তাহারা ততদিন সংগ্রাম চালাইতে থাকিবে।

অন্ধকার বনানীর মধ্যে রাতের আঁধার আরও গভীর হইয়া উঠে। সেই অন্ধকার রজনীতে নিঝুম গোপনতার মাঝখানে এতদিনকার বেদনাকে সংগ্রামের রূপ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া মজদুর কর্মিগণ একে একে বিদায় লয়। প্রস্থানের প্রাক্কালে তাহাদের মধ্যে কিভাবে গোপনে মেলামেশা ও আলোচনা চলিবে, তাহাও স্থির হইয়া যায়।

বিহারী, হরলাল ও রহমান তিনজনে একসাথে বনের ভিতরকার পথ দিয়া পল্লির বড় রাস্তাটার দিকে চলে। আশ্রয়হীন ইহারা আজ, যেখানে হউক আজ তাহাদের রাত কাটাইতে হইবে, পিছনে আবার চরের ভয়। অথচ তাহাদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নাই; কারণ এইভাবে এই কয়দিন চলিয়া চলিয়া যেন তাহারা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। সরু, অল্পপরিসর পথের উপর দিয়া অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া পর পর তিনজন চলিয়াছে। এতটুকু অন্যমনস্ক অথবা অসাবধান হইলে তাহাদের পাশের ধানের খেতের পগারের ভিতর পড়িতে হইবে। বিহারী স্বভাবত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক, বিপদ আপদের সম্ভাবনার মাঝখানে তাহার গোঁয়ার্তুমির ভাবই প্রকাশ পায়। সাম্‌নে আকাশের অন্ধকারের মাঝখানে ধীরে ধীরে একটু একটু জ্যোছনা ফুটিয়া উঠিতেছে, বিহারীর মনে যেন অকস্মাৎ স্ফূর্তি জমিয়া উঠিল। সে তড়াক্ করিয়া এক

লাফে রহমানের কাছে অগ্রসর হইয়া তাহার কোর্তার পকেটে হাতের থাবা দিয়া বলিল: দেখি রহমান ভাই, বিড়ি দেশলাই বার কর দেখি। ধর্মঘট, ধর্মঘট শুন্‌তে শুন্‌তে গলা মুখ একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে।

রহমন পকেট হইতে বিড়ি দেশলাই বার করিয়া বিহারীর হাতে দিয়া বলে: ধরা, ভাই, একটা তিনজনে খাওয়া যাক্।······তহবিল খালি!

* * * *

প্ল্যাট্‌ফর্মের বাতি আর সটেশনের সংকেত-আলো ক্রমশই তাহাদের নিকটতর হইতে লাগে। মালগাড়িগুলির শান্টিংএর আওয়াজ অন্ধকার রাত্রির মাঝে বেশ জমিয়া উঠে। আপের একখানা লোকাল গাড়ি বাঁশি বাজাইতে বাজাইতে একেবারে ওভারব্রিজটার তলায় আসিয়া থামিয়া যায়। অন্ধকারের মধ্যেও সে ওভারব্রিজ তার কাল মূর্তি লইয়া যেন অদৃশ্য হইতে চায় না।······

নিশাচর এই তিনটি মজত্বর মালগাড়ির লাইন পার হইয়া ওভারব্রিজের উপর উঠে। স্নবিধামত একটু জায়গা করিয়া রাতটা কাটাইবার উদ্দেশ্যে। গ্রীষ্মের সময় এই পুলের উপর একটা সূচ ফেলিবারও স্থান হয় না। অবজ্ঞাত, অজ্ঞাত, বহুবিধ ব্যক্তি রাত্রির শীতল হাওয়ায় এইখানেই নিশা যাপন করে। কিন্তু এখন শীতকাল······পৌষের প্রচণ্ড শীতে যাহাদের এই আশ্রয় ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না, তাহারাই

শুধু এই মুক্ত স্থানের শৈত্যের দৌরাত্ম্য অগত্যা মাথায় করিয়া লয়।

রহমন, বিহারী আর হরলাল ওভারব্রিজের উপর আসিয়া দেখে একদম্ ফাঁকা......কোন জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। সুবিধামত একটা জায়গায় ইহারা শুইবার বন্দোবস্ত করিতে যাইবে এমন সময় খানিকটা দূরে মানুষের আওয়াজ পাওয়া গেল। অগ্রসর হইয়া তাহারা দেখিতে পাইল কতকগুলি কাপড়চোপড়ের মধ্যে এখানে কে যেন শুইয়া আছে। অঘোর ঘুমের মাঝে বেশ নাকডাকার শব্দ হয়। রহমন বিহারীর মুখের পানে চাহিয়া বলে : কেরে ভাই এটা !

'একটা ধাক্কা দিয়ে দেখাই যাক্‌না, কে?' বিহারী বলে।

সামান্য ধাক্কাতেই ঘুম ভাঙিয়া যায়। কাপড়-চোপড়ের মধ্য থেকে যেন একটা মরা মানুষ কথা বলিয়া উঠে : কে?

বিহারী আনন্দের আতিশয্যে রহমনের গায় ঢলিয়া পড়িয়া বলে : আরে, এ যে দেখ্‌ছি জঙলী।

রহমান আর হরলালের মুখ থেকে ঠিক একই সময়ে কথা বাহির হইয়া আসে : জঙলী !

জঙলী চোখ মেলিয়া চাহিয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠে : গোটাকয়েক পয়সা দাও না। তিন দিন, তিন রাত এক পয়সার চানাচুর খেয়ে আছি।

বিহারী বলে : জঙলী, আমাদের অবস্থাও তাই ! কাজ নেই...রোজগার নেই...মাথা গুঁজবার ঠাঁইও নেই !

অনশনক্লিষ্ট জঙলী সহজে কথা বলিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে তেমনই কাতরভাবে বলে : তিন তিন মরদ ছুটো পয়সা দিতে পার না ?

হরলাল বলে : পয়সা সত্যিসত্যিই ওদের কাছে নেই ! আজকের খোরাকি থেকে এই চারটে পয়সা কোনরকমে রেখেছি। এই নে, জঙলী, যাহোক্ কিছু খেয়ে নে !

জঙলী এমন অসময়ে পয়সা কয়টি পাইয়া মনে মনে বড়ই খুশি হইয়া পড়ে। ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া বাজারের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতে করিতে সে বলে : ভাই, জমির রোজ রোজ আমাকে সাধ্‌ছে ধর্মঘটীদের সব খবর দিতে পারলে বখ্‌শিশ দেবে। পয়সার লোভে অধর্মে ত আর নাম্‌তে পারি না ! তোমরা আমাকে একটু-আধটু যদি না দেখ, তবে খিদের জ্বালায় রাস্তায় হয়ত মরেই থাকব।

জঙলীর কথায় হরলাল একটু ভাবে। তারপর শান্তকণ্ঠে বলে : কাল ঠিক্ এমনি সময় এখানে দেখা হবে। আমাদের এখন শুধু পেটের ভাবনা নয়—সাম্‌নে অনেক কাজ !

জঙলী অলস নির্জীব দেহ লইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া যায়।···

জঙলীর প্রস্থানের পর তিনজনে তাহারা ওভারব্রিজের উপর শুইয়া পড়ে। পরিশ্রান্ত দেহ শীতের প্রচণ্ডতা অগ্রাহ্য করিয়া ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়ে......সকল কোলাহল তাহাদের নিকট স্তব্ধ হইয়া যায় !

* * * *

প্রভাতের আলোর সাথে চায়ের দোকানগুলিতে ভিড় জমিয়া যায়। মাটির ভাঁড়ে করিয়া মজুর, কুলিদের মেয়ে-পুরুষরা, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা চা পান করিতে বসিয়া যায়......জীবনের এ একটা যেন মহা কোলাহলের ক্ষণ...... সারা দিবসের চলার গতির জন্য তাহারা যেন এক এক পয়সায় শক্তি কিনিয়া লয়।

রোশেনালী অনেক পূর্বে আসিয়াছে বলিয়া রাস্তায় পাতা একটা বেঞ্চির উপর বসিবার সুযোগ পায়। চা পান করিতে করিতে রোশেনালী অন্যান্য লোকদের সাথে আলাপ জমাইয়া তুলে। হঠাৎ সে দেখিতে পায় লাইট-পোষ্টটার তলায় বসিয়া জঙলী সবেমাত্র এক ভাঁড় চা কিনিয়া খাইতে বসিয়াছে। অনেক দিন পরে পুনরায় জঙলীর সহিত রোশেনের দেখা...... রোশেনের মন সহসা বিচলিত হইয়া উঠে......সে ব্যস্ততার সহিত সকলের আলাপ এড়াইয়া, চা পান শেষ করিয়া জঙলীর পাশে গিয়া দাঁড়ায়। ক্ষুধাক্লিষ্ট উদরে সবেমাত্র খানিক গরম তরল পদার্থ পড়িয়াছে, ঠোঁটের চায়ের ভাঁড় ছাড়া অন্য দিকে জঙলীর নজর দিবার অবসর ছিল না। একেবারে পিছনে পরিচিত কণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া মুখের ঢোঁকটা গিলিতে গিলিতে ফিরিয়া দেখে রোশেন। সেই রোশেন! চায়ের চুমুকটা শেষ করিয়া ক্ষীণদৃষ্টিতে জঙলী রোশেনের কাতর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠে: কি? রোশেন!

রোশেন উত্তরে বলে : অনেক দিন দেখা হয় না, তাই……

'কিন্তু তার কি দরকার' জঙলী বলে।

মাটির ভাঁড়ে আবার একটা চুমুক দিতে সে মনোনিবেশ করে।

রোশেন বলিয়া উঠে : আমি তোমাকে ভালবাসি, জঙলী!

কিন্তু আমি কি তোমাকে কম ভালবাসি, রোশেন? জঙলী উত্তর দেয়। জঙলী আবার চায় চুমুক দেয়!

রোশেন সেই লাইট-পোষ্টটার পাশে তেমনই দাঁড়াইয়া থাকে।

চা পান শেষ করিয়া জঙলী উঠিয়া পড়ে। মাটির ভাঁড়টা মাটিরই উপর ফেলিয়া জঙলী বলে : রোশেন, ভালবাসা খুব ভাল জিনিষ, কিন্তু খাবারটা যে আরও বেশি দরকারী।

রোশেন সেখানে নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। দূরে একজন বাবু সওদা লইয়া মুটের খোঁজ করে। রোশেন চলিয়া যায়।

বার

শীতের কুয়াসাময় রাত……প্রকৃতির হিম আলস্য শয্যায় ডাক দেয়!

মজদুরদের ঘর নাই, বাড়ী নাই। আশ্রয়ের প্রশ্ন তাহাদের কাছে শুধু এক উপহাস……হিমেলা বায় আচ্ছাদনহীন ত্বকের উপর যখন পরশ লাগায় পরিশ্রান্ত চোখে হয়ত ঘুম আসে কিন্তু মাথা রাখিবার ঠাঁই চারিদিক খুঁজিয়াও তাহারা পায় না,—শীতার্ত দেহের পরিচ্ছদও তাহাদের জোগাড় হয় না। হতভাগ্য এই সর্বহারা মানুষ!

হরলাল অনেকক্ষণ ওভারব্রিজের লোহার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ঠাণ্ডা লোহার ছোঁয়ায় হাতের পাতায় কাঁপুনি আসিয়া পড়ে কিন্তু তবু তাহা সে ছাড়িতে পারে না। নিদ্রার টাল সামলাইতে এ অবলম্বন তাহার চাই।

জঙলীর খোঁজ নাই……অপেক্ষায় অপেক্ষায় হরলালের ঘুম আসিতে চায় কিন্তু ঘুমে বাধা হয় চিন্তা, জঙলী কেন এখনও আসে না। কোথাও কি এক টুকরা রুটি বা এক পেয়ালা চা পাইয়া জমিয়া গেল, না কোথাও শুইবার জায়গা পাইয়া সেখানেই রাত কাটায়। রাত বাড়িয়া যায়…… হরলালের অপেক্ষারও আর শেষ হয় না।

হরলালের হয়ত একটু ঘুমের ঝোঁকই আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই সে জঙলীর আবির্ভাব বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে পারে

নাই। তন্দ্রার ঘোর কাটাইয়া দিয়া হরলালের আচ্ছন্ন শ্রবণে জঙলীর ডাক আসিয়া পড়েঃ হরলাল।

ওভারব্রিজের লোহার উপর হরলালের হাতের মুঠি একটু আল্‌গা হওয়াই স্বাভাবিক······সহজ চেতনা ফিরিয়া আসিতে না আসিতেই নিজের ক্ষণিক অসতর্কতাটুকু সংশোধন করিবার সন্ত্রস্ত ঝোঁকে সে নড়িয়া উঠে,—জঙলীর গায়ের কাপড়-চোপড়গুলি হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া তাহার গায়ে লাগিতেই সে বলিয়া উঠেঃ এত দেরি কেন, জঙলী !

জঙলী উত্তরে বলেঃ রোশেনের সংগে দেখা হ'ল······সে তার বাসায় নিয়ে গেল······মাসানের খবর পেলাম।

'মাসান কেমন আছে, জঙলী ?' হরলাল প্রশ্ন করে।

'ভাল ! রোশেন তাদের খুব ক'রল এ অসময়'। জঙলী বলে।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী মাসান মজদুর জীবনের প্রতিটি দিনের দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়া প্রতি মজুরের অন্তরংগ হইয়া রহিয়াছে। মজদুর জীবনের আত্মীয়তার ভিত্তি পারিবারিক সম্বন্ধের উপর আর কতটুকুই বা, কারখানার প্রাচীরের এপারে ও ওপারে প্রতিমুহূর্ত একত্র সমভাবে ব্যথা ভোগ করিয়া অর্থের উন্মাদনা ও ভোগের লিপ্সার অনাচার দেহের পাঁজরে পাঁজরে যাহারা অনুভব করে তাহাদের বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সৃষ্টি এইখানেই এম্‌নি করিয়াই হয়। আর তারই জন্য এক মজদুর যেমন করিয়া নিজের দুঃখের জন্য কাঁদিতে পারে আর

একজনের জন্য ঠিক তেমন করিয়াই কাঁদিতে শিখে। সকল মজতুর আজ তাই মাসানের মুক্তি চায়······সকল মজুরদের তুঃখ-ব্যথার অবসান চায়······তাহাদের পথ চলিবার প্রতিটি পদশব্দ সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

তুনিয়ার মজতুর, এক হও।

মাসান বন্দী······বস্তির গোলমালে নিরপরাধ মজতুরদের ছয়জন ঐ পথের যাত্রী······সমগ্র মজতুর শ্রেণী আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন······নিরাশ্রয় শ্রমিকরা বস্তি ছাড়িয়া পথে মাঠে ঘাটে ছেলেমেয়ে লইয়া পড়িয়া রহিয়াছে······কর্মীদের পিছনে গুপ্তচরের বিভীষিকা। অনাহার তুর্দশা তাহাদের শিয়রে।

জেলে মাসানের সাথে রোশেনের অদ্য সাক্ষাতের দিন ছিল। দেখা করিয়া রোশেন যখন ফিরিতেছিল তখন জঙলীর সংগে তাহার দেখা হয়। তারই ফলে জঙলী মাসানের খবর কিছু পাইয়াছে। হরলাল সবিস্তারে জঙলীর মুখ হইতে মাসানের সংবাদ শুনিতে লাগিল। সমস্ত শুনিবার পর সে মাসানের মুক্তির দিন গুনিতে লাগিল······মাসান ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইবে, যে-বন্ধুদের সাথে সে একদিন এক ধর্মঘটে পাশাপাশি যুঝিয়াছে তাহারা আজ শ্রমিকশ্রেণীর সমস্যা ভুলিয়া গিয়া চিরাচরিত অবস্থা মাথায় করিয়া লইয়া দিন কাটাইতেছে না······লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রাচীরের আবেষ্টনীর মাঝখানে সে যেমন বন্দীজীবনের যাতনা ভোগ করিতেছিল তেমনি তাহার বন্ধুরাও সেদিন লোকচক্ষুর সাম্‌নে প্রাচীরহীন

মুক্ত জগতপ্রাংগণে অনাহার আর অত্যাচারের মধ্যে মুক্তির কামনায় সংগ্রাম করিতেছিল···এই সামান্য চিন্তাটুকু সর্বহারা মজুরদের কাছে কম আত্মপ্রসাদের বস্তু নয়।

জঙলী হরলালের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া গায় একটা ধাক্কা দিয়া বলিয়া উঠে: আকাশের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে কি এত ভাবছ······আমাকে ডাকা হ'ল কেন?

হরলালের হুঁস হয়······সে জঙলীর পানে চেয়ে বলে: আজ খাওয়া হয়েছে, জঙলী!

জঙলী হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠে······অর্থহীন হাসি। তবু সে হাসি হরলালের দুঃখময় জীবনে নিছক কল্পনার নয় বলিয়াই সে তাহার অর্থ বুঝিল। হাসিতে হাসিতে জঙলী বলে: আজ কিছু খেয়েছি, হরলাল। হামিদা চাচী খান দুই রুটি দিয়েছিল। পেটটা ভরে খেয়েছি।

জঙলী আবার হাসিতে সুরু করে। ক্ষুধিতের হাসি বড় তীব্র······বড় ভর্ৎসনাদায়ক!

'আজ এত হাস্‌ছিস্ কেন জঙলী।' হরলাল বলে।

জঙলী উত্তর দেয়: পেটটা যে ভরা, হরলাল ভাই।

হরলাল সহাস্যবদনে বলে: দু'খানা রুটি খেয়েই এত হাসি! কথাটা বলিয়া সে থামিয়া যায়, তারপর বলে: কিন্তু তোর হাসিতে যে তুই খেতে পাস্ না তারই ঝাঁজ কিন্তু সে কার জন্যে······আমাকে যে দেখছিস্ আমিও তোর চেয়ে বেশি-কিছু ভাল নয়······পেটটায় এখন যে খিদে তাতে

ত্নু'খান কেন খানদশেক রুটি বেশ খেয়ে ফেল্‌তে পারি! তোর এ ঝাঁজ এখানে কে শুন্‌বে জংলী, ও বাতাসেই মিশে যাবে।

'কিন্তু বাতাসেই ত ঝড় হয়, হরলাল' জংলী বলে।

হরলাল জংলীর কথায় আশ্চর্যান্বিত হয়······হাঁ করিয়া তাহার পানে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া থাকে······চাহিয়া চাহিয়া দেখে এ আর সে জংলী নয়······অর্থের আতিশয্যের পাশে অনাহারের নিত্যনৈমিত্তিক আস্বাদ তাহার মত সামান্য একটা মেয়ের ধারণায় ও কথায় সুষ্ঠু পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। চমৎকার এ মজত্নুর জীবন!

জংলীর সংগে হরলালের আজ অনেক কথাই আছে······ কিন্তু কি লইয়া সে এর সংগে কথা সুরু করিবে ইহাই সে ভাবিয়া সারা হয়। খানিক চুপ চাপ্‌ থাকিয়া সে বলে: আজ না হয় ত্নু'খানা রুটি জুট্‌ল······কালকের কি ব্যবস্থা হবে!

জংলী বলে: তা এখন জানি না।

হরলাল বলিয়া যায়: আমাদের এখানকার ধর্মঘটীদের লড়াই চালাবার, খাবারের বন্দোবস্ত করার জন্য কংগ্রেসীরা ইউনিয়নের সংগে যোগ দিয়ে একটা কমিটি ক'রেছে। মজুর ফৌজও আজ তৈরী হ'য়ে গেছে। কংগ্রেসীরা চাল ডাল এনে এখানকার নতুন কমিটি আফিসে জমা করেছে।···কাল সকাল থেকে ফৌজের লোকেরা সব মজুরকে দেবে। তুইও কাল থেকে পাবি।

জঙলী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানায়। কিন্তু, একটু পরেই বলে: তা' হ'লে কংগ্রেসীরা কারখানার মনিবদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল বল! এখন থেকে তা'হলে ওরা আমাদের বন্ধু।

হরলাল বলে: হাঁ, ওরা কিছুদিন ধরেই কেবল আমাদের বলে কংগ্রেসে যোগ দিতে, ওদের সংগে স্বাধীনতার জন্য লড়তে। বলে, দেশকে স্বাধীন করতে না পারলে আমাদের ওপর যে শোষণ চলছে তা বন্ধ হবে না।

জঙলী আবার প্রশ্ন করে: কিন্তু, এ'ত আর স্বদেশী নয়? এতে কেন ওরা এল?

হরলাল উত্তরে বলে: দেখ, এতদিন ত' ওরা কেবল আমাদের কাছে বক্তৃতা দিয়েছে। আমরা হরতাল করার পরই কংগ্রেস অফিসে গিয়ে বলি যে আমরা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে লড়াই সুরু ক'রেছি। আমাদের লড়াই-এ লড়বে এস—আমাদের এ লড়াইকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের সংগে যদি নিতে না পার তাহ'লে আর তোমরাও আমাদের পাবে না।

জঙলী কথাগুলি মন দিয়াই শুনিতেছিল। কি ভাবিয়া সে আবার প্রশ্ন করে, এতেই ওরা রাজি হ'ল কি ক'রে···ওরাও ত মালদারের দালাল?···তোমার মনে নেই, সেই অনেক দিন আগে, বস্তির মিটিং-এ এক ভাই বলেছিল কংগ্রেসীরা মালদারের দালাল; ওরা লড়াই চালাবার বুলি কপচায় আমাদের ওপর জুলুম পুরোপুরি চালাবার সুবিধা আদায়

করার জন্য···আমরা মালদারীর বিরুদ্ধে লড়াই করি ওরা তা মোটেই পছন্দ করে না···মজদুরের জন্যে আছে শুধু লালঝাণ্ডা! আর লাল আঞ্জুমান।

হরলাল জানাইল: সে কথা মনে আছে। কিন্তু কংগ্রেস ত আর এখনও সেই ছোট্টটি নেই। এখন অনেকেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে আর সবাই-ই ত' মালদারের দালাল নয়! এখনকার কংগ্রেসের বেশি লোকই স্বাধীনতার লড়াই চালাতে চায়। ওরা ব'ল্‌ছিল মজুরকে বাদ দিয়ে লড়াইয়ে জেতা সম্ভব নয়। তাই মজুরকেও স্বাধীনতার লড়াই চালাবার কথা বলে। আর এটা ত আমরাও দেখেছি শুধু লালঝাণ্ডা আর মজুরের আঞ্জুমান সম্বল করে আমরা লড়াইয়ে পুরোপুরি জিততে পারছি না। আমাদেরও ত বন্ধু পাওয়া দরকার। লালঝাণ্ডা ত মজুরের হাতিয়ার—হাতিয়ারটাকেও ত শক্ত করা দরকার···শক্ত হাতিয়ার না হ'লে আমরা জিতবো কি দিয়ে···

অবশ্য জংলী মুখে স্বীকার করিল কথাটা সত্য। কিন্তু তবু যেন তাহার মনের মধ্যে কংগ্রেস সম্বন্ধে প্রশ্ন থাকিয়া যায়।

হরলাল এবার আসল কথা পাড়িল: আচ্ছা, একটা ভাসা-ভাসা কথা শুন্‌ছি, রোশেন নাকি মুসলিম লীগের মেম্বার হ'য়ে কলের ইউনিয়নে ঢুকতে চায়?

'কই আমি তা'ত কিছু শুনিনি?' জংলী বলে। হরলাল বলিয়া যায়: তা তুই নাও জান্‌তে পারিস্, কিন্তু মুসলিম

লীগ ত এখানে এসে আড্ডা গেড়ে বস্‌ছে···মুসলমানদের ধর্মের নামে ডেকে বল্‌ছে হরতাল ভাঙ্‌তে।

'হরতাল ভাঙ্‌তে' কথাটা যেন জঙলীর মাথায় মুগুরের মত আঘাত করিল। সে অত্যন্ত হতাশ ভাবে প্রশ্ন করিল: কল কি তা' হ'লে আবার চল্‌বে? হরলাল বলে: ঠিক বলা যায় না। তবে মুসলীম লীগের লোকেরা যেভাবে বক্তৃতা দিচ্ছে তাতে অনেক মুসলমানই কলে যাবে মনে হচ্ছে।

সংবাদটা জঙলীকে অত্যন্ত মুষড়াইয়া ফেলে। তাহার অনাহার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও একমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই হরতাল। এই হরতালে মজুরের জয় হইলে তবেই তাহার পক্ষে পুনরায় চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা। আশার এই ক্ষীণ রেখাটুকুও বুঝি-বা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। অতি সন্তর্পণে নিজের দুর্বলতা গোপন করিয়া জঙলী জানিতে চাহে: আচ্ছা, এসব ভাইদের কি একবারও মনে হ'চ্ছে না এসময় কাজে যাওয়া অন্যায়। আমাদের উপর যে জুলুম চলে তার কোনো প্রতিকার হোল না, আমাদের দাবি মিল্‌ল না অথচ ওরা কাজে যাবে? ওদের উস্কানী দিতে এ আপদ আবার এল কেন?

"টাকা, টাকা জঙলী।" হরলাল উত্তেজিত হ'য়ে বলে, "তা না হ'লে কি আর শুধু শুধু মালিকদের জন্যে গলাবাজি ক'রে মর্‌ছে এখানে। হতভাগারা সব মুসলমান ভাইদের কাছে ব'লে বেড়াচ্ছে, হরতালটা শুধু হিন্দুদের স্থবিধা আদায় করার

ফন্দি। মুসলমান যেন এ সুযোগ না হারায়। হরতাল ভেঙে কাজে যাও। কল চালু হ'লে মুসলমানদের সুবিধা হবে।"

উহাদের কথা আর অগ্রসর হইবার অবসর পায় না। হঠাৎ তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে "এই যে" কথাটি। তাহাদের সামনেই বাবুলাল কমরেড্ সান্যালকে সংগে করিয়া উপস্থিত হয়।

হরলালকে দেখিয়া কমরেড্ সান্যাল যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন: ওঃ, কি যে খোঁজাখুজি করছি তোমাকে! হরলাল একটু আশ্চর্য হইয়া বলে: কেন, এইত একটু আগেই কম্‌রেড্ বারীর কাছ থেকে আস্‌ছি আমি।

কমরেড্ সান্যাল বলিলেন: কমরেড্ বারী 'ষ্টাইক কমিটির' অফিসে অপেক্ষা কর্‌ছেন। তোমার এক্ষুণি সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।

হরলাল ও কম্‌রেড্ সান্যাল জঙলীকে সংগে লইয়া কমিটি ঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বাবুলালও চলে।

কারখানার কাছেই, বড় রাস্তার উপরে ছেদীলাল জমাদারের বস্তি পার হইয়া আর একটা বস্তির শেষ সীমানায় বর্তমানে 'ষ্ট্রাইক কমিটির' কার্যালয়। ঘরের মেঝেয় মাহুর পাতা। একটি কেরোসিনের আলোর চারিপার্শ্বে বসিয়া কমরেডরা অপেক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু, তবুও মানুষের তো মন! স্থির হইয়া থাকিতে পারে না, সকলের মধ্যেই বর্তমান অবস্থার একটা-না-একটা

সমস্যা বারে বারে আঘাত করিতেছিল। ষ্ট্রাইক…ইউনিয়ন… মজুরফৌজ…মুসলীম লীগ…কংগ্রেস…ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট।

অবশ্য ইহাদের মধ্যে বাক্যের যাদুকর কম্‌রেড্ বারী আসর জমাইয়া তুলে। কংগ্রেসের সম্পাদক অজিত দত্তকে তিনি বলিতেছিলেন ঃ সংগ্রামই হ'ল মজুরদের শিক্ষার ক্ষেত্র। প্রত্যেক দিন কাজের মধ্য দিয়ে অজ্ঞ মজুরও ক্লাস-কন্‌সাস্ হ'য়ে ওঠে, সংগ্রামকৌশল শেখে। আমাদের এখন সব থেকে বড় কাজ ওদের রাজনৈতিক শিক্ষার সুযোগ ক'রে দেওয়া—এ সুযোগ হারালে আমরা আবার বহুদিন পেছিয়ে যাব। এই কারখানার লড়াইয়ের ভেতর দিয়েই সব ভাইদের পরিষ্কার দেখিয়ে দিতে হবে শুধু কারখানার মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রলেই মজুরশ্রেণীর মুক্তি সম্ভব হয় না। কারখানার মালিকরা ত' বর্তমান রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থা চিরস্থায়ী রাখার পক্ষপাতী। কাজেই, আমাদের সত্যিকারের লড়াই চালাতে হ'বে, পরিবর্তন-বিরোধী সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও। এ সমাজ-ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখতে যারা চায় তারাও কারখানার মালিকদের মত প্রগতি-বিরোধী। কারখানার বাইরেও যেমন এ' সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক রয়েছে ঠিক তেমনি কারখানার বাইরেও মজুরশ্রেণীর মত বর্তমান সমাজের বিরোধীশক্তি রয়েছে, যারা আমাদেরই মত এ সমাজের আমূল পরিবর্তন চায়—কাজেই আমাদেরও এখন থেকে সব সময় চেষ্টা ক'রতে

হবে যাতে আমরা এই সব প্রগতি-পন্থী শক্তিগুলোকে এক ক'রতে পারি—আর সেই সমবেত শক্তি নিয়ে শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীন সমাজের বনিয়াদ তৈরী করতে পারি।

সম্পাদক অজিত দত্ত এতক্ষণে তাঁর বক্তব্য বলিবার সুবিধা পাইলেন। কম্‌রেড্‌ বারীকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়াই তিনি তাঁহার প্রশ্ন উথাপন করিলেন: ওসব ত বুঝলাম কিন্তু বর্তমানে মুসলীম লীগ্‌ যে সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে মুসলমানদের কংগ্রেসবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী ক'রে তুল্‌ছে তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা ক'রছেন?

"আরে ভাই, in the fire of practice সবই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নির্যাতিত জনগণের কাছে খালি বাণী দিয়ে কাজ হবে না। দৈনন্দিন সংগ্রামে জনগণ বাণীর সত্যাসত্য যাচাই করবার শক্তি অর্জন করে। ওরা প্রতিদিনের লড়াইয়ে যাদের সাহায্য পাবে, যাদের সমর্থন পাবে তাদেরই নিজের ব'লে জানবে, তাদের মধ্যেই জনগণের ভবিষ্যত দেখ্‌তে পাবে। আগুন জ্বালাও তা হলেই হবে। মুসলীম লীগ, হিন্দুমহাসভা—ও সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ইত্যবসরে কম্‌রেডরা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলের যথাযথ ভাবে বসা হইলে হরেন দত্ত কথা আরম্ভ করেন:

আপনারা সকলে জানেন যে আমাদের একতা নষ্ট করার জন্য এখানকার সব মুসলমান ভাইদের কাছে লীগের নেতারা যাতায়াত আরম্ভ ক'রেছে। সব ভাইদের হরতাল

ভাঙ্‌তে বল্‌ছে। এই সময় আমাদের সব কম্‌রেডকে বিশেষভাবে কর্মঠ হতে হবে, আমাদের একতাকে বজ্রের মত কঠিন ক'রে তুল্‌তে হবে। লড়াইয়ে আমাদের জিততেই হবে। আমাদের কথা সব ভাইদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাই এখন আমরা হিন্দি ও উর্দুতে লিফ্‌লেট ছাপিয়ে এনেছি। আজ রাত্তিরেই এসব বিলি ক'রে ফেল্‌তে হবে।

ঘরের এক পাশ হইতে বাবুলাল বিশেষ উৎসাহের সংগেই বলিয়া উঠিল: নিশ্চয়ই! ওসবই আমরা বিলি করে দেব। তবে এগুলি বিলি করবার আগে একবার সকলকে পড়ে বুঝিয়ে দেওয়া হোক্।

সমবেত কম্‌রেড্‌রা একবাক্যে সম্মতি জানাইল। কম্‌রেড্ সান্যাল সকলকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। বাংলা অনুবাদ করিলে তাহা দাঁড়াইত নিম্নরূপ:

কম্‌রেড্,—আমরা যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য হরতাল ঘোষণা করেছি তা আর নতুন ক'রে বলবার দরকার নেই। এ সংগ্রামে জিততে হ'লে আমাদের সব ভাইকে এক সাথে লড়তে হবে। সকলে একসংগে লড়বার প্রতিজ্ঞা ক'রেই আমরা কাজ ছেড়েছি—এ কথা আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, হিন্দু মুসলমান সব ভাই আমরা এক নিয়মের অধীনে একই সংগে কাজ করি। আমাদের সকলেরই নালিশ একই নিয়মের বিরুদ্ধে। আমাদের নালিশ জানাবার শেষে রাস্তা হরতাল। হরতাল ভেঙোনা—লড়াই চালু রাখ। জয় আমাদের হবেই।

তের

উষার প্রথম ঝলক আলো আসিয়া পড়িল "ষ্ট্রাইক-কমিটী'র সম্মুখস্থ ময়দানটার উপর,...

কংগ্রেস সেক্রেটারী অজিত দত্ত কার্যালয় হইতে বাহির হইয়া ময়দানে আসিলেন। সংগে তাঁহার খদ্দর পরিহিত কয়েকজন কংগ্রেসকর্মী !

মজুর-ফৌজের ক্যাপ্টেনের সংকেত ধ্বনিত হইয়া উঠে। মুহূর্তের মধ্যে মজুর-ফৌজের সেনানীরা একত্রিত হইয়া কুচকাওয়াজ স্বরু করে !'

ক্যাপ্টেনের নিকট হইতে পুনরায় সংকেত পাইবামাত্র খাকি প্যাণ্ট ও সার্ট পরিহিত সেনাদল সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া যায়।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে তাহারা দাঁড়াইয়া থাকে স্থির... ধীর...নিশ্চল।

'ষ্ট্রাইক-কমিটী'র কার্যালয়-গৃহের ছাদে শীতের সূর্যালোকে কংগ্রেস পতাকা চক্‌চক্ করিয়া উঠে।

...ধামা ধামা চাল আর ডাল প্রভৃতি আহারের উপকরণ লইয়া হরেন দত্তের সাথে কংগ্রেস-কর্মীরা আসে।

অল্পসময়ের মধ্যে হাজার হাজার মজুর কংগ্রেসের লোকের আহ্বানে ময়দানের দিকে অগ্রসর হয়।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশের সাথে সাথে ফৌজের সেনারা নায়কের ইসারা পায়···চোখের পলক পড়িবার আগেই একে একে সবাই চাল বিতরণ করিতে প্রস্তুত হয়।

খাকি প্যাণ্ট পরণে চশমা চোখে বিহারী কাগজ কলম লইয়া ক্যাপ্টেনের পাশে আসিয়া দাঁড়ায় আর একজন একরাশ টিকেট লইয়া হাজির হয়।

চাল ডাল পয়সা লইয়া আর আর সকলে দলে দলে বিভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে।

সহসা 'কম্রেড' এই ডাকে প্রত্যেকে সচকিত হয়।

হরেন দত্ত শান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠে: কমরেড্, ঐ দেখ আসে আমাদের হাজার হাজার ভাই মজদুর জীবনের শত শত লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে নালিশ জানাবার জন্য অনাহারী, উপবাসী; আমাদের এ সংকট দিনে আমরা আমাদের সামর্থ্য নিয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। মজদুরদের পণ রক্ষা হ'ক এই আমাদের কামনা।

মজুর-ফৌজের মধ্যে সমকণ্ঠে ধ্বনিত হয়: মজদুর জিন্দাবাদ!

বরখাস্ত শ্রমিকদের দল একে একে ময়দানে আসিয়া পৌঁছায়। মজুর-ফৌজের মধ্য হইতে রহমান আগাইয়া আসিয়া সবাইকে অভ্যর্থনা করে। চাল বিতরণ পর্ব সুরু হইতে যাইবে ঠিক এমন সময়ে রহমান নায়কের অনুমতি লইয়া জলদ্গম্ভীর স্বরে সুরু করিল: আজ আমরা কল-

মালিকদের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি···ক্ষতি আমাদের এ সত্য, তবু আমাদের যুঝে চল্‌তে হবে। আমরা যে কয়জন মুসলমান আছি তাদের কলে ভিড়াবার জন্য লীগের লোক চেষ্টা ক'রছে ···অনেক ক'রে আমাদের সমঝাচ্ছে কিন্তু মুসলমান যারা আছ তারা ভুল ক'রনা। হরতালে জিতলে তবে না আমাদের চাকরি কায়েমি হবে···বালবাচ্ছা তুটো দানা পাবে! হাল ছেড়ে এখনই যদি আমরা ওদের তুয়োরে গিয়ে দাঁড়াই তাহ'লে আমরা আমাদের হাল ভাল ত ক'রে নিতেই পারব না বরং যা ছিলাম তার চেয়েও খারাপ থাক্‌তে হবে। ভুল ক'র না, ভাই। ভুল ক'রনা হিন্দু ভাই, মুসলমান ভাই। সব এক জোট হ'য়ে থাক···তোমাদের জোট যেন কেউ না ভাঙতে পারে! মনে রেখো আমরা আর কিছু না···শুধু মজতুর!

রহমনের কথাটা শেষ হইতেই কংগ্রেস-সেক্রেটারী অজিত দত্ত কিছু বলিবার অবসর পাইলেন। তিনি চাল বিতরণে মজুর-ফৌজকে নির্দেশ দিতে দিতে বলা স্থরু করিলেন: এই যে তোমাদের ফৌজের কাছ থেকে তোমরা এক এক মুঠি চাল নিচ্ছ এ তোমাদের বাঁচবার রসদ···যুঝবার বল। দেশের লোক যে তোমাদের সমর্থন করছে এ তার পরিচয়। তোমরা লড়···লড়বার ক্ষমতা তোমাদেরই আছে···তোমরাই পারবে তোমাদের অবস্থা ঠিক ক'রে নিতে...হাঁটু ভেঙে তাঁদের কাছে কিছু পাবে না, বন্ধু, লড়তে লড়তেই না তোমরা তোমাদের ন্যায্য পাওনা পাবে।

তারপর তিনি মজুর-ফৌজের প্রতি উদ্দেশ করিয়া বলিলেন : এই তোমাদের হাজার হাজার মজদুর ভাই। এদের নিয়ে তোমাদের লড়তে হবে···লড়াই শিখাতে হবে, শিখ্তে হবে।

বিহারী একটা টিকিটের উপর এক একজন মজুরের নাম লিখিয়া টিকেট মজুরদের দেয়। ঐ টিকিট লইয়া পর দিবস আবার তাহাদের চাল ডাল লইতে আসিতে হইবে ।

ছেলে মেয়ে পুরুষ চাল ডাল লইয়া ফিরিয়া যায় সেই প্রান্তরের পর যেখানে আজ এই হাজার হাজার আশ্রয়হীন মানুষদের ক্ষণিকের বসত।

সেদিনকার মত ঐ কাজ শেষ হওয়ায় মজুর-ফৌজ মুক্তি পায়।

ক্যাপ্টেন বিহারীকে প্রশ্ন করিলেন : রোশেনকে খবর দাওনি!

'···হরলাল ত' জঙলীকে সেখানে পাঠিয়েছে শুনলাম'··· সে উত্তর দেয়।

কিছুক্ষণ তাহারা অপেক্ষায় থাকে।

দূরে দেখিতে পাওয়া যায় জঙ্গলী ছুটিয়া ছুটিয়া আসে। হাওয়ায় তাহার গায়ের কাপড় ওড়ে, বিহারী দেখিতে পায়।

ক্যাপ্টেনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সে বলে : জঙ্গলী আস্ছে!

মুহূর্তের মধ্যে জঙ্গলী ময়দানে আসিয়া পড়িল। ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করিল : রোশেন কই!

জঙ্গলী বিহারীর পানে তাকায়। চোখে তাহার চশমা, পরণে খাকি সার্ট দেখিয়া প্রথমে সে চিনিতে পারে না।

সে ক্যাপ্টেনের কথার উত্তর দেয়ঃ আজ আবার মাসান চাচার সঙ্গে তার সাক্ষাতের দিন। সে বাড়ী নাই।

জঙলী মনোযোগের সাথে বিহারীর চশমার পানে তাকায়।

বিহারী বলিয়া উঠেঃ দেখ্‌ছিস্‌ কী জঙ্গলী, আমি বিহারী!

জঙ্গলী হাসে।

ক্যাপ্টেন বলেঃ রোশেনদের চাল নিয়ে যা—আর তোরও নে। বিহারী, দুটো টিকিট দাও।

ক্যাপ্টেন চলিয়া গেলে বিহারী আহ্লাদের সংগে হাসিয়া উঠে।

জঙ্গলী হাঁ করিয়া থাকে।

বিহারী বলেঃ জঙ্গলী, আমি মজুর-ফৌজের লোক।

জঙ্গলী সেলাম করিয়া সরিয়া পড়ে।

* * * *

প্রভাতের পর থেকে জঙ্গলীকে দেখা গেল প্রান্তরে বিতাড়িত মজুরদের মাঝে।

অনেক দিন পরে জঙ্গলীকে দেখিয়া বুড়া-বুড়ীরা ডাকিয়া আলাপ করে···জোয়ান ছেলে-মেয়েরা দূরে দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করে···কচি বাচ্ছারা নাচিতে নাচিতে দুলিতে

দুলিতে কাছে আসে। সবাই দেখে এই সেই জঙ্গলী কারখানার গেট্ খুলিলে যখন তাহারা লাইন বন্দী হইয়া কলের কাজে যাইত তখন হাতের নিড়ান খানিক ফেলিয়া রাখিয়া কারখানার বাগানের ঘাসের উপর বসিয়া হাঁ করিয়া ইহাদের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত···এই জঙ্গলী।

জঙ্গলী অল্প সময়ের মধ্যেই অগণিত জনস্রোতের মাঝে মিশিয়া গেল···সন্ধ্যার গোধূলিবেলায় বলাকা যেমন ভাসিয়া যায় আকাশের গায়।

দুপুরের একটু আগে জঙ্গলী সবে ওয়াহেদালীর ছোট ছেলেটাকে লইয়া খেলা করিতেছিল—হঠাৎ দূরে কিসের একটা বাঁশি বাজিয়া উঠিল। সংগে সংগে দেখিল খাকি কোর্তা পরণে একদল যুবক এদিক আসে···জঙ্গলী খেলা ছাড়িয়া উঠিয়া যাইতে চায়···ছেলেটি হাত টানিয়া ধরিয়া বলে: যাচ্ছ, কোথায় গা। ওরা এখানেই ত আস্‌বে। ছেলে মেয়েদের দুধ আন্‌বে, রোগীর দাওয়াই আন্‌বে, ভারী ভাল লোক ওরা।

ছেলেটির কথায় জঙ্গলী বুঝিল যে এই মজুর-ফৌজ!

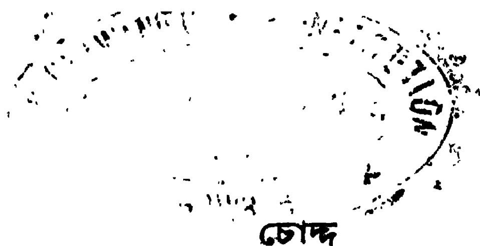
জঙ্গলী সবিস্ময়ে দেখিল যে এই সেবারত কর্মীদের মাঝে কয়েকজন কলের লোক।

ভিড়ের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের কাজ করিয়া যায়। চশমাধারী বিহারী জঙ্গলীর একেবারে গা ঘেসিয়া যায়··· জঙ্গলী ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে একটা সেলাম জানাইয়া

হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠে : আমার চোখে চশমা—তবু—তবু আমি কিন্তু সেই বিহারী !

জঙ্গলী সেলাম ফিরাইয়া দিয়া আবার মিশিয়া যায় হাজার হাজার মানুষের মাঝে যাহারা সবাই আজ তাহারই মতন।

মাতার ক্রোড়ে শিশুরা দুধ খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে···রোগীরা পথ্য পাইয়া আরাম পায়...মাটির ঘাসের উপর গৃহহারা হাজার মানুষের বেদুইন সংসারে খানিক একটু হাসি ফোটে··· সহজ, স্বচ্ছন্দ।



চোদ্দ

কল বন্ধ হইয়া গিয়াছে আর তাহার সাথে নিরব হইয়াছে বিপুল ইঞ্জিন...স্তব্ধ বয়লারের গর্জন। কল চলিবার তালে তালে শত শত মজুরের হাত আর চলে না...দেহের শক্তির প্রবাহও বহে না...অভিমানে একবার তাই বাজিয়া উঠে না কারখানার বাঁশি।

কয়েকটা দিন পরে।

প্রভাতের আকাশটাকে চমকিত করিয়া সেদিন আবার বাঁশি বাজিল।

আগেকার মত কারখানার ফটক খুলিয়া গেল···দেখা যায় নেপালী গেট্‌ম্যানের সাম্‌নে দিয়া একে একে ভিতরে প্রবেশ করে একদল মানুষ···একেবারে নূতন, সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রতিদিন যাহাদের দেখা যাইত এ তাহারা নয়···সে জঙ্গলী নাই···সে রোশেন নাই···তাহারা কেউই নাই! এরা সম্পূর্ণ একদল নূতন শ্রমিক,—কলের কাজে আসিয়াছে।

আজ আছে পাঞ্জাবী হিন্দু, পাঞ্জাবী মুসলমান, নেপালী, উড়িয়া আর পশ্চিমা মুসলমান যাহারা খবর রাখে না যে, এই কলে আগে যখন বাঁশি বাজিত তখন কলের কাজে আসিত আর একদল লোক। কল-কারখানার প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সংগে তাহাদের যে অস্তিত্ব ছিল তাহা আজ আর নাই।

এই নূতন মানুষদের সংগে চলে সেই সরদাররা, কিন্তু সরদারের হুম্‌কী আজ আর নাই। আরও চলে জমির, বিলাত আলী আর তাহাদের লোক যাহারা আগেও যেমন আসিত আজও তেমনি আসিয়াছে। তারপর আসিল মুসলীম লীগের কর্মীরা পতাকা উড়াইয়া ও শ্লোগান আওড়াইয়া—ফটকে, কলের কাজে নয়···যাহারা কলের কাজে নূতন ভর্তি হইয়াছে তাহাদের গেটের সামনে পৌঁছাইবার জন্য।

কারখানার শেষ ঘণ্টা বাজিয়া গেল।

* * * * *

সাম্‌নের চায়ের দোকানে দুইজন মুসলমান চা পান করে। টেবিলের উপরকার উর্দ্দু কাগজখানার উপর শুধুমাত্র চোখ রাখিয়া পড়িবার ভাণে তাহারা নিজেরা কথা বলাবলি করে।

'……সহসা পাঞ্জাবী, নেপালীর এত আমদানী কোত্থেকে হ'ল, হরলাল?'

হরলাল বলে : এই দু'দিন ট্রেণ বোঝাই হয়ে কেবল এরাই আস্‌ছে।

কথা বলিতেছে সনৎ আর হরলাল। মুসলমানের বেশে তাহারা বাহির হইয়াছে...উদ্দেশ্য কারখানার ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করা।

দুইজনায় চা খায় আর আলাপ করে। কারখানার সব বাঁশি বাজিয়া যায়...ইঞ্জিন চলিতে সুরু করে...বয়লারের আওয়াজও উঠে......

সনৎ চায়ের কাপ ও সংবাদপত্রের উপর হইতে নজর তুলিয়া কারখানার পানে চায়। দৃষ্টিতে তাহার উদাস অলস ভাব!

খানিক কি চিন্তা করিতে করিতে সে হরলালের পানে চাহিয়া বলে: লোকের যা বহর দেখ্‌ছি তাতে সিকি কলটা চালু হ'লেই ঢের।

হরলাল ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয়।

সহসা সনৎ হরলালের গায় একটা জোর ধাক্কা দিয়া বলিয়া ওঠে: করিম খাঁ!

হরলাল বলে: করিম খাঁও এল!

'দেখ্‌ছি ত ভাই,' সনৎ বলে।

'হরলাল, ভাই, করিম খাঁর মান খুব বেড়েছে...গেটের প্রহরীটা সেলাম দিল!'

ফটক খোলা ও বন্ধ হওয়ার ঝনাৎ শব্দ ইহাদের কানে ভাসিয়া আসে।

চায়ের দোকানটার লোক বলে: নয়া হেড্‌ ফোরম্যান সাব্‌!

সনতের মাথায় আর কিছু ঠিক থাকে না। টেবিলের উপর পয়সা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ে।

দুইজনায় খানিক একসাথে পথ চলে। ধর্মঘটীদের আড্ডার কাছে আসিয়া ইহারা দাঁড়াইয়া পড়ে।

স্বেচ্ছাসেবকগণ জনতার মাঝে খাবার বিলি করিয়া বেড়ায়। জঙলী তাহাদের সহিত মিশিয়া তাহাদের সহায়তা করে।

হরলাল বলে : জঙলীটা কয়েকদিন ছুটো খেতে পাচ্ছে বলে মেজাজটা তার ঠিক আছে।

সনৎ কোন উত্তর দিতে যাওয়ার আগেই রহমন কাছে আসে।

সনতের কানে কানে কথা বলিয়া সে বিদায় লয়।

* * * *

গোধূলিসন্ধ্যায় স্তিমিত আঁধার যখন ধরার বুকে নামিয়া আসে তখন সনৎ একবার করিম খাঁর বাসার দিকে যায়। আজ আর কড়া নাড়িয়া লতাকে তাহার ডাকিতে হয় না, দোতলার দিকে নজর পড়িতেই সে দেখিতে পায় রেলিং-এর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে একজন সুদর্শন পাঞ্জাবী যুবকের সহিত কথা বলিতেছে।

ইসারায় সনৎ ডাক দেয়।

কয়েক মিনিট পরে বৈঠকখানায় আসিয়া লতা সনৎকে দেখা দিল।

লতার মুখ থেকে হয়ত কোন কথা বাহির হইয়া আসিতেছিল কিন্তু তাকে আমল না দিয়াই সনৎ বলিয়া উঠে : ও ছেলেটি কে ?

'বাবার অন্তরংগ লোক...কলে কাজ করে...'লতা উত্তর দেয় !

'তোমার বাবা কলের হেড ফোরম্যান' ? সনৎ প্রশ্ন করে।

লতা ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দেয় : হ্যাঁ।

সন্ধ্যার আবছা কুয়াসার মধ্যে সনৎ মিশিয়া যায়।

পনর

মানুষের জীবনে দিন আসে আর যায় কিন্তু এমন এক-একটা দিন আসে যাহা চলিয়া গেলেও দাগ রাখিয়া যায়।

শ্রমিকের সংঘর্ষময় বিপদসংকুল জীবনের সাথে তাল রাখিয়া চলা লতার ধাতে সহিল না, তাই চারিদিককার এই ব্যাপক পরিবর্তনের সুযোগ লইয়া সেও বিদায় লইল। আঘাত একটা সনৎ পাইল সত্য কিন্তু তাহা সহ্য করিবার ধৈর্যের অভাব তাহার ছিল না। তবুও যেন সেদিন যে-লতাকে সে চোখের উপর দেখিয়াছে তাহার স্মৃতি তাহার দেহ মনে একেবারে জড়াইয়া গিয়াছে। এ দাগ মুছিতে চায় না।......

আবার কল চলিতে সুরু করে। এবার যাহাদের লইয়া কল চলে তাহাদের কিছু লোক পূর্বতন ধর্মঘটী। লীগের মেম্বর হইয়া আবার তাহারা কারখানায় আসে। সমস্যার সমাধান ইহারা কিছুই পায় নাই। যেসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে তাহারা কারখানা ছাড়িয়াছিল তাহার সবখানি স্বীকার করিয়াই ~~না তাহারা~~ কলের কাজে আসিল! হয়ত কল-কর্তৃপক্ষ সাময়িক কিছু কিছু সদ্ব্যবহার দেখাইতে লাগিলেন কিন্তু তাহা শুধু মাত্র নিজেদের কাজ হাসিল করিবার জন্য, পরে কিছুদিন বাদে সেই একই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইবে; কারণ মজুর ও মনিবের সম্বন্ধটা এমনই ব্যবস্থার উপর দাঁড়াইয়া আছে যেখানে ঐ একই পরিণতি দেখা যায়।

ইহাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব ভিতরকার একটা আমূল উলোট-পালট ছাড়া শেষ হইতে চায় না।

কারখানার লেবার ব্যুরোর সাম্‌নে আবার মানুষের ভিড়। কল আবার চলিতে স্থরু করিয়াছে দেখিয়া সব আন্‌কোরা নূতন লোক এই ধর্মঘটের স্থযোগে চাকুরি জোগাড় করিতে আসিয়াছে। এখন যদিও নূতন শ্রমিকরা কল কর্তৃপক্ষের কাছে সদ্ব্যবহার পাইতেছে কিন্তু ইহা কেবলমাত্র বাহ্যিক। বস্তুত আগেকার চেয়ে অনেক কড়াকড়ি নিয়ম ইহাদের মাথায় করিয়া লইতে হইয়াছে।

লেবার ব্যুরোর অফিসারগণ খাতাপত্তর খুলিয়া বসিয়াছেন। এক-একটি শ্রমিক আসে, পাশে সরদার দাঁড়াইয়া তাহার নামধাম যাবতীয় সংবাদ লইয়া বাবুদের কাছে নিবেদন করে। শ্রমিকের প্রতিটি কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে পরীক্ষা হয়। তারপর অন্তত দশবিশখানা কাগজের উপর টিপসহি দিয়া সে কারখানার কাজে লাগে।

এবার যাহারা কাজে লাগিল তাহার ভিতর পূর্বতন ধর্মঘটী ছাড়া আর যাহারা আসিল তাহাদের মধ্যে বাহিরের লোকই বেশি। কল-কর্তৃপক্ষের নিজের হাতের আমদানী লোক। এত কাণ্ডকারখানা করিয়াও তাহারা পুরাপুরি কল চালাইতে পারিল না......কারখানার একাংশের কলই চলিতে থাকে।

আবার কল চলে...মানুষ কলের চাকা ঘুরায় কিন্তু ইহারা এক নূতন মানুষ। আগে যাহাদের হাতে কল চলিত

ইহারা তাহাদের কেহই নয়। তাহাদের ভিতর হইতে মজতুর সেদিন মরিয়া গিয়াছে যেদিন কারখানার চিমনীর বুক হইতে নূতন করিয়া আবার ধোঁয়া বাহির হইল।

কারখানার গাঢ় কাল রাশি রাশি ধোঁয়া সারা অঞ্চলটার উপর দিয়া সারাদিন ভাসিয়া নীল আকাশের খণ্ড খণ্ড মেঘগুলোর বুকে চুমা দেয় আর শ্রমিকরা ধুলিভরা উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর পড়িয়া সচল কলের শব্দ শোনে।......

অস্তাচলগামী সূর্যের গোধুলিরক্তরাগে গাঢ় কাল ধোঁয়া মিশিতে মিশিতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এতদিনকার স্তব্ধ কলের সাথে কথা বলিয়া ফিরিয়া আসে তার নূতন মানুষরা...সন্ধ্যার পথে যখন তাহারা রাস্তায় নামে তখন তাহাদের মনে হয় যে-আঘাতে কারখানার ওই মানুষগুলো অনাহারী, উপবাসী থাকিয়া দিনের পর দিন ঐ প্রান্তরের বুকে ঘুমাইয়া রহিয়াছে সেই আঘাতের একটা ছিটাও যেন আজ তাহাদের গায় লাগে। পায় পায় চলিতে চলিতে এমন ভাবনায় তাহারা' থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে...আবার তাহারা পথ চলে।

বিরাট বস্তির একটা অংশের কামরায় আবার আলো জ্বলিয়াছে···শ্রমিক জীবনের স্পন্দন সেখানে পুনরায় অনুভূত হয়......ঘরসংসারের আওয়াজ পাওয়া যায়।

শেষ প্রান্তের একটা কামরা ঘর খুলিয়া একজন লোক ঢুকে। পকেটের দিয়াশলাই বাহির করিয়া ছোট্ট প্রদীপটি

জ্বালায়। তারপর বাজার হইতে আনা খানকয়েক রুটি কাগজের মোড়ক হইতে বাহির করিয়া খাইতে লাগিয়া যায়।

কয়েক মিনিট পরেই দরজাটায় একটা টোকা পড়ে। শ্রমিকটি দরজা খুলিয়া অভ্যাগত লোককে ঘরে আনিয়া বসাইয়া দরজায় খিল লাগাইয়া দেয়। দুইজনে দুইজনাকে দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে।

শ্রমিকটি হাসি থামাইয়া বলিয়া উঠে: চুপ্, সনৎ, চুপ্।

সনৎ বলিয়া উঠে: বাবুলাল...থুড়ী...মুসাফির খাঁ!

বাবুলাল তাহার আহার সমাপ্ত করিয়া মাটির ভাঁড় হইতে এক বাটি জল লইয়া গিলিয়া ফেলে। কয়েক মাস ধরিয়া সযতনে রক্ষিত তাহার ছোট্ট দাড়ীটুকু জলে ভিজিয়া মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে। সনৎ সেই দৃশ্য দেখিয়া চাপা হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠে: দিব্যি দাড়ীখানা হ'য়েছে এই কটা মাসেই।

কে আবার না ব'লবে মুসলমান!

বাবুলাল একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে টানিতে বলে: এর পরে আবার কে মুসলমান বলে অস্বীকার ক'রবে...মুসলিম লীগের সদস্য...কলের মুসলমান মজুর...কেমন সনৎ ভায়া!

সনৎ উত্তর দেয়: খুব সামাল, ভাই! তোমার পরিচয় যেন প্রকাশ না পায়।

বাবুলাল খুব আহ্লাদের সংগে উত্তর দেয়: সে বিষয় তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, সনৎ!

সনৎ শান্তভাবে বলে ঃ পীর সাহেবের দরগায় গিয়ে যখন কল্‌মা পড়্‌তে হ'ল তখন বোধ হয় মনে তোমার কষ্ট হচ্ছিল, বাবুলাল!

বাবুলাল উত্তর দেয় ঃ কেমন একটু লাগ্‌ল বই কী?......

'দুঃখ আবার কী? তুমি খাঁটি মজুর, তোমার আবার একটা ধর্ম কী?...তবু এ একটা কঠিন কাজ! তার জন্য সকলের হ'য়ে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' সনৎ বলে।

একটু থামিয়া বাবুলাল বলে ঃ জঙলী কি বলে?

সনৎ হাসিভরা মুখে বলে ঃ জঙলী?...সে আবার কি বল্‌বে...শুধু হাসে।

বাবুলাল বলে ঃ হাসে শুধু?......পাগলী কিনা তাই!

কিছুক্ষণ আর কেহ কোন কথা বলে না। বাবুলাল আবার একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইয়া টানিতে সুরু করে।

আশে পাশের কামরাগুলোর কোলাহল শোনা যায়। আর একটু পরে নূতন মানুষদের লইয়া সারা বস্তিখানা ঘুমাইয়া পড়িবে।

সনৎ খুব গাম্ভীর্যের সাথে সুরু করে ঃ করিম খাঁকে আমরা চাই। সে যতইনা অন্য ধরণের লোক হ'ক তাঁর অন্তরটা ভাল। গত ধর্মঘটে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু লতাকে বিশ্বাস করো না।

বাবুলাল সনতের মুখের দিকে তাকায়। খুব মনোযোগের সাথে নিরীক্ষণ করিয়া ভাবে, ঐ মুখচোখে কোন-কিছু আছে না কী ?

প্রকাশ্যে সে বলে : তুমি বোধ হয় পাঞ্জাবী যুবকটার কথা ব'লছ ! ভয়ানক ছেলে......করিম খাঁকে হাত ক'রেছে।

অসহিষ্ণুর মত সনৎ বলিয়া উঠে : সে আমি জানি, তবু করিম খাঁকে আমরা চাই। আমরা সারা মিল অঞ্চলে ধর্মঘট আন্‌ব। একটা ঝড় আবার উঠ্‌বে।

সনৎ বলিয়া যায় : দিকে দিকে ধর্মঘটের বাজনা সুরু হ'য়েছে, প্রায় সব জায়গায় পাটকল অঞ্চলের মজদুররা এটা-সেটা দাবি নিয়ে ধর্মঘট ক'রতে যাচ্ছে। এবার যে জলতরংগ আস্‌ছে চারিধার থেকে তা' নিরস্ত করে নিশ্চিন্তে বাস করা মালিকদের বোধ হয় সম্ভব হবে না। দেশের সরকারকেও এবার চোখ মেলে আমাদের পানে চাইতে হবে।

বাবুলাল মাথা নিচু করিয়া ভাবে।

রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলে। বস্তির নূতন বসতিগুলোর কলরব ক্রমশ কমিয়া আসে। সনৎ চলিবার উপক্রম করে।

নিজের ডান হাত বাবুলালের দিকে সনৎ প্রসারিত করিয়া দেয়। বাবুলাল তাহার হাত ধরিয়া লইয়া নাড়া দেয়।

সনৎ বলে : মাসানের মুক্তির দিন আসন্ন......তার আগে কারখানার ভিতরকার অবস্থা সম্পূর্ণ শান্ত থাকা চাই।

বাবুলাল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দরজার খিল খুলিতে অগ্রসর হয়।

সনৎ আবার হাতখানা কপালে ঠেকাইয়া বলিয়া উঠে: আদাব, মুসাফির খাঁ!

বাবুলাল হাসিয়া ফেলে।

*   *   *   *   *

শহরের অনতিদূরে বনানী পরিবেষ্টিত আবছা অন্ধকারের মধ্যে মনোরম অট্টালিকা···আধুনিক সর্বপ্রকার উপকরণে গৃহখানি সুসজ্জিত......বিরাট ফটক বিশিষ্ট লোহার রেলিং দ্বারা চারিধার ঘেরা......ছোট লাল লাল রাস্তা সবুজ ঘাসের উপর দিয়া প্রাঙ্গনের এধার-ওধার চলিয়াছে।

শীতের শেষ বসন্তের আসন্ন আগমন ঘোষণা করে। তার সামান্য কিছু চিহ্ন এই অংগনের মাঝেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। লাল রাস্তার ধারে ধারে নানা ফুল গাছে নানা বর্ণের ফুলই তার পরিচয় লইয়া স্তিমিত জ্যোছনার আলোয় শোভা পায়।

সনৎ এই পর্যন্ত আসিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়ে। যদিও শীত তখনও কিছু কিছু আছে কিন্তু এত বেশি নয় যে তাহা এড়াইয়া চলা যায় না। পরিশ্রান্ত দেহে এই আবহাওয়া অনেকটা সোয়াস্তি দেয় তাই সনৎ আরও কিছুক্ষণ দাঁড়ায়।

চারিদিক নিস্তব্ধতায় ভরা......টুঁ শব্দ পর্যন্ত নাই।

শরীর ও মস্তিস্ক অনেকটা হাল্‌কা বোধ হইলে সনৎ

বৈঠকখানার সিঁড়ির মুখে আসিয়া পৌঁছায়। হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা একটা টুলের উপর বসিয়া ঝিমাইতেছিল। সনতের হাতের একটা ধাক্কা লাগিতেই সে জাগিয়া উঠে।

সনৎ প্রশ্ন করে: অজয়বাবু কোথায়?

দারোয়ান উত্তর দেয়: আপনার অপেক্ষায় এতক্ষণ নিচেই ছিলেন। এই উপরে গেলেন। চলুন।

দারোয়ানের সাথে সনৎ অজয়বাবুর কক্ষে গিয়া পৌঁছায়। রুদ্ধকক্ষে অজয়বাবু ও সনতের আলাপ চলিতে থাকে।

'বাবুলালের খবর পাওয়া গেল?' অজয়বাবু প্রশ্ন করেন।

সনৎ উত্তরে জানায়: সে ঠিক কাজ করিতেছে। অজয়বাবু বলিয়া উঠেন: বাহবা বাবুলাল।

'বাবুলাল নয়......মুসাফির খাঁ।' সনৎ বলে।

অজয়বাবু বলেন: ও......মুসলমানী নাম বুঝি ওই হল? খুব ভাল নামই বেছে নিয়েছে বাবুলাল।

'ও কি আর নিজে রেখেছে! মুসলমান হবার সময় ঐ নামই তার সাব্যস্ত হ'য়েছে।' সনৎ উত্তর দেয়।

অজয়বাবু টেবিলের উপরকার কেস্ হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজে একটা ধরায়, আর একটা সনৎকে দেয়। দু'জনেই সিগারেট পান করিতে থাকে।

সনৎ সিগারেটটা শেষ করিয়া অজয়বাবুর মুখের পানে তাকায়। তারপর বলে: কংগ্রেসের টাকা প্রায় শেষ...... আরও কিছু তোমাকে দিতে হবে।

'কেন, আবার আমায় কেন !' অজয়বাবু বলেন। 'তাদের সাহায্য কি আর আস্‌বে না ?'

সনৎ স্মিতমুখে বলে : অজয়, তুমি কি মনে কর তোমার এই জায়গাটার শ্রমিকদেরই শুধু দুঃখ কষ্ট ? তা' নয়। মজুরের ব্যথা কোন স্থানে কোন দেশে সীমাবদ্ধ নয়। এটা সারা বিশ্বের সমস্যা। আমাদের এখানে যে আলোড়ন দেখছ সাগরে পারের সমস্ত দেশেও এই একই প্রশ্ন !......ধর্মঘট তোমার এখানে যা দেখছ ঠিক এমনই সমগ্র পল্লিঅঞ্চলে সুরু হ'য়েছে। কংগ্রেসই কেবল অনাহারী মজুরদের ভার নিয়েছে।

সনতের কথার মধ্যে বাধা দিয়া অজয়বাবু বলেন : কেন, লীগ ত ক'রছে—অন্তত তাদের স্বজাতীয় শ্রমিকদের !

সনৎ উত্তরে বলে : কি ক'রছে তারা তাদের স্বজাতির ! তারা তাদের কলের দাস হ'য়ে থাকার জন্য প্ররোচিত ক'রছে......কলের প্রভু হবার জন্য ত উদ্বুদ্ধ করে না !

সনৎ বলিয়া যায় : তোমার লীগ নিজের জাতির মানুষদের বিদেশীর কারখানার শত অবমাননার মধ্যে হাত ধরে নিয়ে যেতে পারে...আঙুল দিয়ে দেখায় ঐখানেই তাদের রুটি কিন্তু লাঞ্ছনার অবসান ত করতে পারে না !

সনৎ খানিক চুপ থাকে, তারপর আবার বলে : এ ধর্ম প্রতিষ্ঠান···এ শ্রেণী-সংগ্রামকে আমল দেয় না ; কারণ এ এর বিরুদ্ধে। রহমান, মাসান, রোশেন মুসলমান হ'য়েও তাই এর সাহায্য পায় না কোনদিন !

ঠাকুর আসিয়া সনতের খাবার রাখিয়া যায়।

আহারে বসিয়া সনৎ আর কোন কথা বলে না। এই নিরবতা ভংগ করিয়া অজয়বাবু বলেন: এর মধ্যে আমাদের পাড়ায় একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল......ওপাড়ার বাগ্দিদের একটা বিধবা বৌ মুসলমান হবার জন্য শহরে যাচ্ছিল...... আমাদের পাড়ার কয়েকজন ছেলে হিন্দুসভা, হিন্দুমিশন করে বেড়ায়। তারা খবর পেয়ে তাকে গিয়ে ধরে কিন্তু তার একেবারে অটল জিদ, সে মুসলমান হবেই। অনুসন্ধানে জানা গেল, গাঁয়ের একজন প্রৌঢ় মুসলমানের প্রতি বিশেষ আসক্তিই এ ধর্মানুরাগের কারণ। ব্যাপারটা লইয়া বোধ হয় একটা দাংগা বাধবার উপক্রম হ'ত কিন্তু আমি ছেলেদের বললাম, ধর্মের বালাই নিয়ে গোলমাল না ক'রে তাদের এই প্রেমকেই বলবৎ হ'তে দাও।

সনতের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। সে শেষ চুমুক জল খাইয়া হাত মুখ ধুইতে উঠিবার উপক্রম করে।

অজয়বাবু বলিয়া উঠেন: কেমন ঠিক বলি নি, সনৎ?

সনৎ উত্তরে বলে: আমি ওসব জানি না, অজয়! বহুদিন একত্র বাস করিয়াও স্বামীর স্মৃতি বিধবা ভুলিয়া যায়...... দু'দিনের ভালবাসা......মেলামেশা আর কতটুকু! নিজেরই অগোচরে যেন সনতের বুকটায় খচ্ করিয়া উঠে সেই সেদিনকার দাগ।

ষোল

শেষ শীতের আকাশময় বর্ষার আশংকা।

খুব ভোরেই স্নানধ্যানাদি সমাপন করিয়া অজয়বাবুর হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা কাঠের একটা স্ট্যাণ্ডের উপর তুলসীদাসের রামায়ণখানা সযত্নে রাখিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতেছিল। বৈঠকখানায় বসিয়া অজয়বাবুর ঘুম-ভাঙার অপেক্ষা করিতে করিতে সনৎ এক-একবার চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া যখন তাঁহার নিচেয় নামার কোন সাড়া পাওয়া গেল না তখন সে এদিক-ওদিক পায়চারি করিতে করিতে হিন্দুস্থানী দারোয়ানটার কাছে যাইয়া হাজির হইল।

হিন্দুস্থানীর কণ্ঠে রামায়ণীগানের সুললিত সুর সদর প্রকোষ্ঠটিকে একটা মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল। আগ্রহ সনতের সেদিকে বিন্দুমাত্রও ছিল না; বরং দারোয়ান এখন রামায়ণের পাতাটা বন্ধ রাখিয়া তাহার সহিত গল্পগুজব জুড়িয়া দিলেই সে বাঁচিয়া যাইত। দারোয়ানকে উদ্দেশ করিয়া তাই সে বলিয়া উঠিল: রামায়ণ পড়া হ'চ্ছে, দারোয়ান সা'ব?

পাপের ভয় যাহারা পাপ মানে তাহাদের কাছে সেটা ভয়ানক। রামায়ণ পাঠে ব্যাঘাত জন্মাইয়া অন্য কথোপকথন করা ধর্মশাস্ত্রে অন্যায় বলিয়াই দারোয়ানটির পক্ষে সনতের

কথায় উত্তর দেওয়া সম্ভব হইল না। সে একভাবেই অধ্যয়নে রত রহিল।

সনৎ কিন্তু অত লক্ষ্য করিল না। সে বলিয়া উঠিল : কি এমন একটা পড়ছ ছাই, যে কথার একটা উত্তর দেওয়াও চলে না!

খোলা রামায়ণ পড়িয়া রহিল, ক্রুদ্ধ দারোয়ান তড়িৎবেগে উঠিয়া সনতকে এমন চিৎকারের সঙ্গে গালিগালাজ সুরু করিয়া দিল যে সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল অথচ সে বিশেষ করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই ব্যাপারটা কিসে এত গড়াইল।

দারোয়ান হয়ত এতক্ষণ তাহাকে প্রহার করিয়াই বসিত কিন্তু গোলমালের আওয়াজে অজয়বাবু ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় ব্যাপারটা থামিয়া পড়ে।

ঘটনার বিবরণ শুনিয়া অজয়বাবু হাসিয়া ফেলিলেন, সনতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : তোমার অন্যায়, সনৎ! ওদের রামায়ণ পাঠের সময় কথাবলা ওদের অধর্ম!

'কথা সে না বল্‌লেই পারত, আমি ত আর বিশেষ-কিছু জেদ ধরি নি : সনৎ বলে।

হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা আবার কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু অজয়বাবু তাহাকে নিরস্ত করিয়া পুনরায় রামায়ণ পাঠে যাইবার জন্য ইঙ্গিত দিলেন।

'...ওদের বড় গোঁড়ামী, সনৎ। ঐ দেখ, আপন মনে মন্তর না কি আওড়াচ্ছে...কিছুক্ষণ পাঠ বন্ধ হ'ল কিনা তারই স্বস্ত্যয়ন বোধ হয়!' অজয়বাবু বলেন।

ভক্তির চোটে বেচারী রামায়ণের মর্যাদাটা নষ্ট ক'রে বসেছে...সনৎ বলিয়া উঠে।

অজয়বাবু চুপ করিয়া হাসেন।

সনৎ বলিয়া যায়ঃ ভণ্ডামীই বল আর গোঁড়ামীই বল এই সবে প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত নয়। অসত্য যা তা সব সময়ই অসত্য!

অজয়বাবু উত্তর দেনঃ আমায় ত' তুমি জান, সনৎ, আমি তা পারি না। এই সংসার...এই বাড়ীর এইই চিরাচরিত নিয়ম। এ সংস্কার শুধু ওর কাছে নয়...আমার এ চারিদিককার গণ্ডির মাঝে ওর মর্যাদা অনেক। তুমি সেটাকে অস্বীকার ক'রে চল্‌তে পার, সনৎ; কারণ কারখানার বস্তির কুঠরিতে দানা বড়, ধর্ম কিছু নয় কিন্তু আমাদের এই সব সংসারে ধর্মই যে অনেক খানি জুড়ে আছে।

'...আমি এখানে কিছু বল্‌তে চাই না, অজয়, দারোয়ানের হাত থেকে মুক্ত হ'লেও মনিবের হাত থেকে হয়ত নিরাপদ নাও হ'তে পারি।' হাসিতে হাসিতে সনৎ বলে।

অজয়বাবু একটু গম্ভীর হইয়া পড়েন...তারপর বলেনঃ তুমি যার ইংগিত করছ আমি তা নই! ধর্মের গন্ধ এখানে পাওয়া যায় কিন্তু উগ্রতা নেই।

সনৎ বলেঃ হাজার হাজার বছরের পুরানো পচা ঐ পুঁথিগুলো মানুষ যে কেমন ক'রে পড়ে আর তার সান্নিধ্য সহ্য করে এ আমার বোধগম্য হয় না। যাঁর গুণগাণে এর

পাতা ভরা সেই রামচন্দ্র কী এমন মানুষ? অন্যের হাতের পুতুল শুধু। ঈর্ষান্বিত ব্রাহ্মণের আদেশে বিদ্রোহী শূদ্রে রসে ঘাতক। সে ত একজন কশাই!

অজয়বাবু উত্তরে কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সনৎ বলিয়া উঠিল: চুপ্ কর, অজয়, চুপ্ কর! বর্তমান যে ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে আমরা গলা ফাটাই সেই শোষণমূলক শাসনের সাথে সেদিনকার ব্রাহ্মণের ধর্মপ্রভাবমূলক শাসনের কোথায় পার্থক্য বল্‌তে পার, অজয়! রাজা সেদিন ব্রাহ্মণের আদেশে দেশ জনপদ ধ্বংস ক'রত আবার বিরাট সাম্রাজ্য হেলায় বিলিয়ে দিত। ব্রাহ্মণের প্রতি একটা অন্ধ আনুগত্য তাঁদের সকল সত্বাকে অন্ধ রাখত। এই রামায়ণই তার প্রমাণ...

ব্রাহ্মণের একটা হুম্‌কিতে সেদিন রাজার সদাচার কোথায় ভেসে যেত। তপোবনবাসী অল্পাহারী ব্রাহ্মণ রাজত্ব ক'রত না কিন্তু আড়ালে থেকে সারা রাজত্বটাকে নাড়া দিত। তোমার গলার ঐ কার্পাসসূতাটায় একদিন ছিল আজকার ইংরাজ-শাসনের তীক্ষ্ণতা! ব্রাহ্মণের শিখার মত তীব্র শুধু ইংরাজের কামান, ডিনামাইট!...

বৃষ্টির আশংকা ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আসিতেছিল। এদিক ওদিক দুইএক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিল। সনৎ বিদায় চাহিল।

অজয়বাবু বলিয়া উঠিলেন: বৃষ্টি বোধ হয় নামল...এখন যাবে কোথায়?

সনৎ উত্তর দেয়ঃ মরণের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দু'ফোঁটা বৃষ্টির ভয়!

অজয়বাবু পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া সনতের হাতে গুজিয়া দেয়। পরক্ষণেই সনৎ প্রস্থানের উপক্রম করিতে করিতে বলেঃ এদিককার খবর কিছুটা ত শুনেছ? সিকি কল ত চালু হ'ল বাইরের লোকে! আমরা ত কিছুকাল চুপচাপ্ রইলুম। এবার কলের গেটে পুরাদম্ পিকেটিং চল্‌বে। কাগজে ত পড়ছো, সব কল এলাকায় রীতিমত গোলমাল, ধর্মঘট, হুজুক পুরাদস্তুর সুরু হ'য়েছে। এবার এ কলের গেটে ধর্মঘটী মজুরের দল অভ্যর্থনা কর্‌তে চলেছে পুলিশের গুলি অথবা লাঠি!

বৃষ্টির টুপ্‌টাপ শব্দের সাথে মরা ঘাসের বুকে আর শুক্‌না মাটিতে জলের ধারা আসিয়া পড়ে। বর্ষার আবছা ছায়ায় সনতকে আর দেখা যায় না।

অজয়বাবু খানিকক্ষণ সেই জায়গায় দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকেন দূরের মাঠটার উপর, যেখানে বর্ষা জল ঢালে, আর তিনি মনে মনে ভাবেন এই যে মজদুর জীবনের সংগ্রাম, এর যবনিকা কোথায়!

বাদল মাথায় করিয়াই সনৎ চলিতে থাকে 'মজুর-ফৌজের' কার্যালয়ের দিকে, তাহার বিন্দুমাত্র বিলম্বও আজ আর সম্ভব নয়; কারণ তাহারই অপেক্ষায় এখন কমরেডরা বসিয়া

রহিয়াছে। সনতের সংগৃহীত অর্থ আসিলেই বরখাস্ত মজুর-দল পাইবে দুপুরের চাল, ডাল!

পরণের কাপড় তাহার সবটাই ভিজিয়া যায়...মাথায় চুলের ভিতর দিয়া জলের স্রোত বয়...শীতে শরীর তাহার ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপে...!

বৃষ্টির ছাঁট ক্রমশ কমিয়া যায়...এতক্ষণে জনমানবহীন পথে আবার মানুষের চলাচল সুরু হয়। মাথার চুল ঝাড়িয়া গায়ের কাপড় নিঙড়াইয়া নিজেকে কতকটা সহজ করিয়া আবার সে পথ চলে। পথে তাহার সংগে লোকের সাক্ষাৎ হয়...দু'একজন মুখ চেনা...ভাগ্যিস্‌ তারা কলের কেউ নয়; কারণ কল তখন পুরাদম চলে।

স্‌টেশন ছাড়িয়া বরখাস্ত মজুরদের আস্তানার পাশটায় যখন সে আসিয়া পড়িল, বৃষ্টি তখন একদম কমিয়া গিয়াছে।

ঘরের ভিতর অজিত দত্ত প্রমুখ কম্‌রেডগণ চিন্তাকুল মনে বসিয়া বসিয়া সনতেরই আগমন প্রতীক্ষা করে। তাহার প্রবেশের সাথে সাথে সকলের কণ্ঠে উল্লাসধ্বনি জাগিয়া উঠে। অজিত দত্ত অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন: সুসংবাদ নিশ্চয়।

কাপড়ের গাঁট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া সনৎ তাহার দিকে ফেলিয়া দিয়া বলে: কাপড় চাই একটা!

বিহারী তাড়াতাড়ি শুক্‌না কাপড় আনিয়া সনতের হাতে দেয়।

অজিতবাবু বলেন : এইবার মজুরদের দানার জোগাড় দেখ। বিহারী, যাও, চাল ডাল আন!

ফৌজের লোক লইয়া বিহারী চলিয়া যায়।

হরলাল সনতের কাছে আসিয়া বলে : সনৎ,এদিকে ত সব প্রস্তুত!

কথা শেষ হইবার আগেই অজিত দত্ত বলেন : গঙ্গার এপার ওপার প্রায় সব পাটকলের মজুর যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। আমাদের বর্তমান এই পরিস্থিতিতে নূতন কর্মপন্থা নিয়ে আমাদের আবার লাগতে হবে···কমরেড, হুঁসিয়ার···এবার আমরা আগুন জ্বালব, হয় পুড়ে নিজেরাই মরব, নয় লাল ঝাণ্ডার জয় গান বাতাস ভ'রে জেগে উঠবে।

একটু থামিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া তিনি মেঝেয় মাদুরের উপর জোরে একটা ঘুসি বসাইয়া বলিতে সুরু করেন : শোন, বন্ধু, কাল থেকে কলের গেটে মজুর তার হাঁতিয়ার নিয়ে খাঁড়া হবে। ...সংগে থাক্‌বে তার লাল নিশান...পিকেটিং ক'রবে তারা মজুরদের পায়ের কাছে পড়ে...এ দিন যে-দল যাবে তার সর্দারী ক'রবে আমাদের কম্‌রেড হরলাল!

হরলাল মাথা নিচু করিয়া তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

কম্‌রেড দত্ত হরলালের পিঠের উপর হাত চাপড়াইয়া বলেন : এই হরলাল হবে কালকের ব্যাচের সর্দার...

সনতের সাথে হরলাল বাহির হইয়া আসে। পথ চলিতে চলিতে হরলাল সনৎকে প্রশ্ন করে : বাবুলাল ঠিক আছে ত?

সনৎ উত্তর দেয়ঃ মুসাফির খাঁ তার দল নিয়ে কাল বার হ'য়ে আস্‌বে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ!

হরলাল চুপ করিয়া থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলেঃ তিন মাস জেল খেটে ফজল, মুরারীরা ছয় জন কাল সন্ধ্যায় ফিরেছে। কালকেই এখানে এসেছিল। চল, একবার তাদের ওখানে যাই। জঙলীর কাছে খবর পেলাম, মাসান সাম্‌নের শনিবার খালাস পাচ্ছে। সেদিন তার অভ্যর্থনার জন্য দত্ত একদল মজুর বাছাই ক'রে রেখেছে যারা সেদিন মাসান আর ফজলদের নিয়ে মিছিল ক'রবে—বোধ হয় তার সর্দার তুমি।

দুইজনায় চুপ করিয়া থাকে কিছুক্ষণ। সনতের কাঁধের উপর হাতখানা রাখিয়া হরলাল বলেঃ কেমন লাগছে, বলত?

সনৎ হরলালের মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসে। তারপর বলেঃ মনে হচ্ছে, হরলাল, আমরা বেঁচে আছি।

কাঁধের উপর হইতে হাতখানা সরাইয়া হরলাল বলেঃ আমারও তাই মনে হচ্ছে। অনুভব ক'রতে পাচ্ছি, গায় রক্তের কিছু উত্তাপ।



সভয়

সারাদিন কল আজ চলে নাই...কারখানার সাম্‌নে পিকেটারদের আবির্ভাবে কর্তৃপক্ষ আজ কল বন্ধ করিয়াছে। কাল চলিবে আবার নিয়মিত।

নূতন মজুর......নানা স্বপ্নে ভরা তাহাদের দিন...... রঙ-বেরঙের জামা কাপড় পরিয়া এক একদল দুপুর বেলায় বাহির হইয়াছে। নূতন জায়গার সব-কিছুই তাহাদের কাছে নূতন। ছুটির দিনে তাহারই একটা আস্বাদ তাহাদের কাম্য।

সবাই নূতন লোক···কেউ কাউকে চিনে, কেউ বা আবার কাউকে চিনে না···রাস্তায় দেখা হয়···কত আলাপ পরিচয় জমিয়া উঠে···উল্লাসের অন্ত নাই।

ইহাদের মধ্যেকার একদল লোক স্‌টেশনের দিকে চলে··· দূরে প্রান্তরে দেখা যায় কারখানার প্রাক্তন লোকদের বসতি... চাপা কোলাহলের আওয়াজ পাওয়া যায়।

দলের মধ্যেকার একজন বলে: বেশ আছে, ভাই, ওরা! খাসা খাচ্ছে দাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে...খাটুনীর বালাই নেই। দিব্যি আরাম!

আর একজন বলে: একটা ছুকড়ী আছে, ভাই, ওই আড্ডায়। আচ্ছা আওরত!

আর একজন বলে: আরে দাঁড়া না...দুটো দিন যাক্... ভাব ক'রে বসব!

উত্তরে দ্বিতীয় জন বলেঃ সে চেষ্টা ক'রতে এখনও বাদ রেখেছি নাকি!

সবাই এক সাথে বলিয়া উঠেঃ কি বলে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘাঁড়টি বাঁকাইয়া সবাইর দিকে তাকাইয়া বলেঃ এত উৎসাহ কিসের? ও আওরত তোদের নাক কান কাট্‌তে পারে। জানিস্ কি বলে?

"কি"...সকলের কণ্ঠে সমস্বরে ধ্বনিত হয়!

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়া চলেঃ বলে আমি ত তোমাদেরই একজন। দলে ভিড়ে পড়...খাঁটি মজদুর হও, আমাদের মত লড়।

প্রথম জন বলেঃ ওরে বাবা! তা' তুই বুঝি ও-দলে ঢুক্‌ছিস্, শালা, আওরতের লোভ? দ্বিতীয় ব্যক্তি একটু লজ্জিত হইয়া পড়ে কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া বলেঃ লোভটা তোরও ত কম নয় কিন্তু এক গ্লাসে সাত আদমী ঝুটা পানি খাব সে আদমী আমি নয়।

ইহার এ-কথার পর কেহ আর কিছুক্ষণ কথা বলে না। তারপর এক জন বলেঃ না, ভাই, কলের কাজ আর পোষাল না...যে-ভাবে লোক সব গেটের সাম্‌নে পড়ে থাকে, মানুষ হ'য়ে কি ওদের ডিঙ্গিয়ে চলা যায়?

তৃতীয় জন বলেঃ কারখানায় সেদিন মুসাফিররা নাকি বলাবলি কর্‌ছিল একদিন আমাদেরও অমন করে ঐ কলের গেটে পড়ে থাক্‌তে হবে!

"কেন...কেন...কেন ?" সকলে একেবারে সমস্বরে বলিয়া উঠে।

দ্বিতীয় জন উত্তর দেয়ঃ কিছু-না-কিছু অসুবিধার জন্যই না এই সব হাংগামা! অসুবিধা সব সময়ই অসুবিধা! কলের কাজে থাক্‌তে দিন দিন আমরা যখন সে সব টের পাব স'য়ে থাকা সম্ভব নাও হ'তে পারে।

দলের মধ্য থেকে একজন বলিয়া উঠেঃ যা ব'লেছিস, ভাই!

আর একজন বলেঃ হাজার হ'ক তারা মনিব, আমরা নোকর! অনেক-কিছুই ত আমাদের সয়ে থাক্‌তে হয়।

"কিন্তু, ভাই", তৃতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠে "যত সওয়া যায় ততই ত চাপ আসে।"

অনতিদূরে জঙলী ছোট ছোট কয়েকটি ছেলে মেয়ে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

জঙলীকে দেখিতে পাইয়া প্রথম জন বলিয়া উঠেঃ আরে নামটা জানা থাক্‌লে একটা ডাক দিতাম।

"জঙলী! ডাক্ না···ডাক" দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়া উঠে।

"ডাক্‌বে! ঘুসি দিয়ে নাকের ডগা উড়িয়ে দেব, শালা! রাস্তায় চল্‌ছিস্···ভাল মানুষের মত চল।" দলের একজন বলে।

* * * * আরও একটু দূরে রেল লাইনের তলায় একটা ছোট মাঠের মধ্যে বসিয়া একদল মজুর কথা বলে। ইহারা তাহাদের এড়াইয়া অন্যদিকে অগ্রসর হয়।

এ দলের মধ্যে আলোচনায় বেশ রীতিমত উত্তেজনা···সুর সবারই সপ্তমে চড়া। খোলা নির্জন মাঠের মধ্যে মুখের কথার বাঁধ খুলিয়া যায়।

বেশির ভাগই চলিতেছিল লীগের আলোচনা! বাবুলাল অর্থাৎ মুসাফির খাঁ সবাইকে বুঝাইতেছিল: তু'পয়সা মজুরীর নোকরী দিয়েছে, লীগ চায় আমরা সব সময় লীগ্ লীগ ক'রব। কানার মত পরের চোখে দেখব ত' আমাদের কথা কে শুন্বে শুনি? হাজার রকম অসুবিধা যে র'য়েছে তা'ত বুঝাই যাচ্ছে। তা না হ'লে ও লোকগুলো কি শুধু শুধু খাপ্পা হ'ল। পেটের দানার যখন কথা, পরের কথায় কি আর কেউ নাচে?

একটি বৃদ্ধ দলের মধ্য থেকে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলে: মুসাফির খুব সাচ্চা কথা বল্ছে।

"আর তা ছাড়া দেখ, ভাই" মুসাফির বলে, "ওদের দলের মধ্যে কত মুসলমান আছে···তারা কত কষ্ট পাচ্ছে। লীগ ত সে-সব দেখে না!"

দলের মধ্য থেকে একজন বলিয়া উঠে: লীগ বলে, ওরা কাফের।

মুসাফির খাঁ বলে: এই ত লীগের কারসাজি! ও-সব চলে না। অন্যায় আমরা সইব না।

পরস্পরে মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া বলে: খাঁর কথাগুলো ভারী সাচ্চা!

সকলে খোস গল্প সুরু করিয়া দেয়। বাবুলাল অল্পক্ষণ থাকিয়া উঠিয়া পড়ে।

স্টেশনে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে সনৎ একাকী পায়চারি করে অনেকক্ষণ। বাবুলাল প্রান্তরের আড্ডা ছাড়িয়া দ্রুতপদে এখানে আসে। দুজনায় চুপি চুপি একটু কথা হয়। তারপর যে যাহার পথে চলিয়া যায়।

* * * *

সন্ধ্যার মজলিসে লতা তাহার বন্ধুদের লইয়া চায়ের আসর জমাইয়া গল্পগুজব করে এমন সময় করিম খাঁ সান্ধ্যভ্রমণ সারিয়া বাসায় ফিরে। লতার ঘরে ঢুকিয়াই বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠেঃ না চাকুরি করা আর চলল না। বড় চাকুরি হ'ল কিন্তু যা গোলমাল...

"কি হ'ল বাবা!" লতা বলে।

করিম খাঁ বলেঃ আর কী হবে? ছেলেরা যা গোলমাল সুরু ক'রেছে তাতে কারখানায় ঢোকা অসম্ভব! সব জানা লোক, বেচারা সনতও রয়েছে! সেবার ওদের কথায় কল ছেড়েছিলাম, এবারও শেষকালে দেখ্‌ছি তাই ক'রতে হবে।

মজলিস থেকে এর কোন উত্তর আসেনা।

করিম খাঁ বলেনঃ পুলিশের মার খাবে, লাঠি চল্‌বে তবু এরা থাম্‌বে না। গুলি চল্‌বে আর কি!

নিজের আসনে বসিয়াই লতা আঁৎকাইয়া উঠে। মজলিশের

আনন্দ হঠাৎ তাহার উঠিয়া যায়। কাতরস্বরে সে তাহার বাবাকে বলে : সনতকে মানা করনা, বাবা।

করিম খাঁ কোন কথা বলে না। শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে : আজ কি এক সনৎ! কত সনৎ আজ এই পথে চলেছে। কাকে বারণ ক'রব, মা। মাসান মুক্তি পেয়ে আস্‌ছে। নিরপরাধ মাসানের উপর কলের মালিকরা এতদিন সাজা দিল, তার বিক্ষোভ যে সারা শহরের রাস্তায় রাস্তায় হবে তারই চল্‌ছে আয়োজন। কারখানার গেটে আবার পিকেটিং সুরু হ'য়েছে। এবার বেশ একটা কাণ্ড ঘটবে দেখ্‌ছি। খবরের কাগজে দেখ সব জায়গায় পাটকল অঞ্চলে এমনই বিভ্রাট।

করিম খাঁ আপন মনে বকিতে বকিতে আপনার কক্ষে চলিয়া যায়। সে সন্ধ্যার আসরে লতা যেন একটা প্রাণহীন পুতুল।

ধীরে ধীরে নিজের আসন হইতে উঠিয়া লতা সকলের উদ্দেশে নমস্কার জানাইয়া বলে : বন্ধুগণ, আজকের মর্ত বিদায়।

অভ্যাগত যুবকগণ একে একে বিদায় লয়। লতা আহম্মদকে বলিয়া উঠে : তুমি যেয়োনা!

পাঞ্জাবী যুবক আহম্মদ ফিরিয়া দাঁড়ায়। লতা আগাইয়া গিয়া তাহার হাত দুইখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া আকুল ভাবে বলে : তুমি যেয়োনা, আহম্মদ, আমি আজ বড় একা।

আঠার

মানুষের জন্য ইটের আড়াল মানুষেরই তৈয়ারী···সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্রয় এখানে নাই; মানুষ ভুলিয়া যায় পৃথিবীর আলো···পৃথিবীর পরপার যেন এ!

রাত্রির শেষ···বারান্দায় বুট-পায় প্রহরী হাঁকিয়া যায় 'এগার নম্বর'। সংগে সংগে ডিউটির মেট্ সায় দেয় 'ঠিক হ্যায়'! কম্বল-শয্যায় এক একটা কয়েদী শেষ তন্দ্রার মাঝে একটু চমকিয়া উঠে—আবার সজাগ এক ঝলক অল্প ঘুমের জন্য পাশ ফিরিয়া শোয়। তন্দ্রালস মস্তিষ্কে প্রহরীর সচল বুটের শব্দ মচ্ মচ্ করিতে করিতে তাহাদের আসন্ন ঘুমের মাঝে মিলিয়া যায়।

ওদিককার নম্বরগুলোর দরজার কুলুপ্ খোলার আওয়াজ হয়······কুলুপ্-মেটের এগার নম্বরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাড়া পাওয়া যায়······এগার নম্বরের মেটের হাঁকডাকে কম্বল-শয্যায় চাঞ্চল্য জাগে!

ঝন্ ঝন্ ঝন্···এগার নম্বরের গেট খুলিয়া দিয়া সিপাই চলিয়া যায়···শয্যা ভুলিয়া কয়েদীর দল ফাইল বাঁধিয়া পায়খানার দিকে অগ্রসর হয়···আশেপাশে প্রহরী আর মেটের তাড়না!

জলের ফাইলের ধারে ফাইল করিয়া বসিয়া কয়েদীর দল নাস্তা খায় আর চাপা গলায় আলাপ করে।

মাসানের চানা থেকে কিছু চানা তুলিয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া একজন কয়েদী মাসানের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া উঠে। মাসান কিছু বলিবার উপক্রম করিতে সে বলিয়া উঠেঃ আজ তো তোর খালাস্‌ মাসান! জেলের চানা আর তোর খেতে হবে না। যাঃ।

পাশের আর একজন কয়েদী বলিয়া উঠেঃ মাসান আজ চল্‌ছে বুঝি!

কয়েকজন কয়েদী একেবারে সমস্বরে সায় দেয়ঃ হাঁ, হাঁ, —মাসানের আজ খালাসের দিন।

একজন কয়েদী একেবারে কাছ ঘেসিয়া বসে। কানের কাছে মুখটা রাখিয়া বল্লেঃ কলাবাগান বস্তিতে ঢুকেই, মাসান, বাঁ হাতে দু'খানা বাড়ীর পর···খবরটা দিস্‌ মাসান। নাম বল্‌লেই সবাই বলে দেবে।

আর একজন কয়েদী আগাইয়া আসে। সে বলেঃ উল্টাডিঙি খালের ধারে জেনানা থাকে। জেলে আসা পর্যন্ত মুলাকাত হয় না। একটা দরখাস্ত করতে বলিস্‌।

বেচারা মেটের চোখে পড়িয়া যায়। প্রহরীর রুল আসিয়া পড়ে একেবারে পিঠের উপর।

ক্ষণিকের একটু গুঞ্জন আবার থামিয়া যায়।

* * * *

কয়েদীর দল···মেট আর প্রহরীর পর্যবেক্ষণে ডিউটিতে চলিতেছে। সহসা মাসানের হাতের মুঠির মধ্যে একখানা

কাগজ গুজিয়া দিয়া একটি শিখ্ ছোক্‌রা বলে : মুরারীকে এই চিঠিখানা দিও।

"কে মুরারী ?" মাসান চলিতে চলিতে প্রশ্ন করে।

"সে দিন যারা খালাস পেল। তোমাদের দলের লোক..." ছোকরাটা উত্তর দেয়।

মাসান চাপা গলায় বলে : ও চিঠি নিয়ে যাওয়া যাবে না। নাম্‌টা বল। খবর দেব।

"সোহং"...ছোক্‌রাটা উত্তর দিয়া চিঠিটা লইয়া সরিয়া পড়ে।

আপিস-ঘরে মাসানের ডাক পরে...মাসান মুক্তি পায়।...

মুক্ত মাসানের সাম্‌নে প্রহরী কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। কয়েক মাসের অনভ্যাস বশত সম্মুখস্থ মাটির ঘাসের উপর মাসানের পা চলিতে চায় না। মাসানের ক্ষণিকের থতমত ভাব প্রহরীর হাঁকে ভাংগিয়া যায়। ছোট্ট দরজাটার ভিতর মাথাটা গলাইয়া সে সহসা বাহির হইয়া পড়ে।

রোশেন, জঙলী আরও দুইজন মজুর মাসানের অপেক্ষায় অনতিদূরে বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া ইহারা একেবারে তাহাকে ছোঁ মারিয়া লয়। তাহার পর স্‌টেশন অভিমুখে অগ্রসর হয়।

ট্রেণে বসিয়া মাসান সংগিদের কাছে চারিদিকে যে কারখানায় কারখানায় আগামী সংগ্রামের আয়োজন

হইতেছে তাহারই কাহিনী শোনে। তাহাদের এলাকার যে পরিস্থিতি তাহা শুনিয়া মাসানের যেন ইচ্ছা হয় একটা মুহূর্তের মধ্যে সে যদি যাইতে পারে যেখানে আছে সনৎ, হরলাল, বাবুলাল, রহমন প্রভৃতি তাহার কারখানার বন্ধুরা। মাসান মনে করে এরোপ্লেনের গতিতে ট্রেণখানা যদি ছুটিয়া চলিয়া তাহাকে এখনই এই মুহূর্তে কারখানার সাম্‌নে তাহার বন্ধুদের মাঝে ছাড়িয়া দেয় তো মন্দ হয়না!

ট্রেণ চলে দু'ধারের প্রান্তরের মধ্য দিয়া—কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী বিরাট কারখানাগুলোর গা ঘেসিয়া...কখনও বা এপাশ ওপাশ দুই পাশের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরের মানুষদের চমকাইয়া পরবর্তী স্‌টেশনের দিকে ছুটিয়া চলে। মাসানের আচ্ছন্ন মনকে এসব খানিক স্বাচ্ছন্দ্য দেয় সত্য কিন্তু মাসানের মন পড়িয়া থাকে যেখানে এখন তাহার বন্ধু মজদুররা পুঁজিপতিদের অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

ট্রেণ প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে…সাম্‌নের স্‌টেশনটা পার হইলেই যে স্‌টেশন পড়িবে সেখানেই মাসান নামিবে। মাসানের বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে। একটু পরেই সে একটা বছর পর দেখিতে পাইবে স্ত্রী, কন্যা…আপনার আত্মীয় বন্ধু…যে আলোড়নে তাহার বন্ধুরা আজ মাতিয়াছে একটু পরেই সে তারই মধ্যে আসিয়া পড়িবে…একটি বৎসরের অত্যাচারিত মাসান!

অসংখ্য ধূমোদ্গীরণ করিতে করিতে ট্রেণখানা আশে-

পাশের বস্তিগুলোকে একেবারে মলিন করিয়া দেয়। মাসানের এসব পরিচিত স্থান। কতদিন সে এসব জায়গায় আসিয়াছে ...এখানকার মানুষদের সাথে কতবার সে মিলিয়াছে, আমোদ করিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। আজ দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিতে এসব তাহার কাছে খাপছাড়া লাগিলেও তাহার স্মৃতিশক্তিকে নাড়া দিয়া জানায় এরা কেহ তাহার অচেনা নয়।

দীর্ঘ একটানা একটা বাঁশি বাজাইয়া গাড়িখানা প্লাটফর্মে প্রবেশ করিল। একটি মিনিট পরেই আবার বাঁশি বাজাইয়া স্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি চলিল।

...সামনেই মাসানের স্টেশন! রোশেন, জঙলী গা নাড়া দেয়। মাসান তাহার টুপ্‌লি ঠিক করিয়া লইয়া প্রস্তুত হয়। একটু দূর হইতেই স্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়। গাড়ি স্টেশনের ভিতর আসিয়া পড়ে। গাড়ির ভিতর হইতে মাসানের চোখে পড়িল স্টেশনের বাহিরে লাল নিশান হাতে অগণিত মজুর—কেহবা পরিচিত, কেহবা অপরিচিত!

নামিতে নামিতে মাসান বলিয়া উঠেঃ কারা ওরা, রোশেন!

রোশেন উত্তর দিবার আগে জঙলী বলিয়া উঠেঃ আমাদের মজুর-ফৌজ!

মাসান মজুর-ফৌজের দৃষ্টিতে পড়িতেই তাহাদের মধ্য থেকে সনৎ আগাইয়া আসিয়া মাসানকে অভ্যর্থনা করিয়া লয়। মজুর-ফৌজের ভিতর হইতে অবিরাম ধ্বনিত হইতে থাকে—মাসান্ ভাইকী জয়!

মাসানকে লইয়া মজুর-ফৌজের বিরাট শোভাযাত্রা সনতের নেতৃত্বে কারখানা এলাকার দিকে চলে। অবিরাম বিপ্লবাত্মক ধ্বনির সাথে শোভাযাত্রার জাঁকজমক মিশিয়া শহরের রাস্তা-গুলো ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল! উৎসুক জনতা চারিদিক হইতে ভাঙিয়া পড়িয়া শোভাযাত্রার আশেপাশে আসিয়া পড়ে।

* * * *

কারখানার এলাকার কাছে আসিয়া শোভাযাত্রা বিপুল আকার ধারণ করে। কারখানার সামনে টিফিনের সময় পিকেটিং করিবার জন্য হরলালের নেতৃত্বে আর একদল মজুর-ফৌজ কারখানার গেটের অনতিদূরে খাড়া ছিল। কর্তৃপক্ষ একটা গোলমাল আশংকা করিয়া টিফিন বন্ধ করিয়া দেয়। যে অল্প কয়জন মাত্র মজুর জোর করিয়া অদ্য কারখানায় ঢুকিয়াছিল তাহারা কারখানার ভিতরকার খোলা ময়দানে সমবেত হইয়া বাহিরের এ শোভাযাত্রা দেখিতে থাকে। টিফিনের সময় কারখানার গেট বন্ধ হয় দেখিয়া হরলালের দল শোভাযাত্রার মধ্যে মিশিয়া যায়। বিপুল মজুর-ফৌজের আড়ম্বরে আর চিৎকারে সারা শহর থম্ থম্ করিতে থাকে।

কারখানার এলাকা পরিক্রমণ করিয়া শোভাযাত্রা মজুর-ফৌজের আপিসের সামনে আসিয়া থামিয়া যায়। হরেন দত্ত ও কম্‌রেড অজিত দত্ত পূর্ব হইতেই সামনের ময়দানে মাসানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটি সভার আয়োজন

করে। কলিকাতা হইতেও কয়েকজন নেতা সংবাদ পাইয়া আসেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন আব্দুল বারি, সান্যাল আর ভৌমিক!

হরেন দত্ত শোভাযাত্রার ভিতর প্রবেশ করিয়া সনতকে কাছে ডাকিয়া বলেন : দুঃসংবাদ, সনৎ!

সনৎ প্রশ্ন করে : কী?

"—কাল রাত্রে অজয় বাবুর বাড়ী ডাকাতি হ'য়ে গেছে। একটু আগে খবর পেলাম।" হরেন দত্ত বলেন।

সনৎ বলিয়া উঠে : কারা ডাকাতি ক'রল? চিন্‌তে পেরেছ?

"খুব সম্ভব জমিরের দল", হরেন দত্ত বলেন। "রোজ রোজ কল কামাই যাওয়ায় রোজ ত ঠিক পাচ্ছে না···ওরাই ক'রেছে খুব সম্ভব। মুখোস্ পরা লোক সব ··ঠিক চিন্‌তে পারিনি। যে চিন্‌তে পারবে সে ত আর ইহজগতে নেই!"

"কে! অজয় বাবু নেই!···" সনৎ চিৎকার করিয়া উঠে।

"অজয় বাবু আছেন কিন্তু তাঁর স্ত্রী আর নেই! অজয় বাবুও আহত অবস্থায় হাসপাতালে। কাল রাত নাকি একটার সময় বন্দুকধারী মুখসপরা লোক অজয়বাবুর শয়ন-গৃহে প্রবেশ করে। ঘুমন্ত অজয়বাবুকে তারা গুলি ক'রতে উদ্যত হয় কিন্তু তাঁর স্ত্রী শব্দ পেয়ে উঠে স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই প্রাণ দিয়েছেন। অজয়বাবু দোতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পালিয়ে

কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়েছেন।” হরেনবাবু এইটুকু বলিয়া থামিয়া সনতের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন।

সনৎ একটু নিরব থাকিয়া তারপর বলে: একবার দেখা দরকার।

হরেন দত্ত বলেন: নিশ্চয়ই!

সনৎ মৃদু হাসিয়া বলে: Comrade Dutt, his contribution to our cause is no small.

সনৎ তৎক্ষণাৎ আপিস-ঘরে চলিয়া যায়। নিজের বেশ-ভূষা ত্যাগ করিয়া মুসলমানের ছদ্মবেশ পরিয়া নামিয়া আসে, তারপর জঙলীকে সাথে লইয়া অন্য পথে হাসপাতালের দিকে রওয়ানা হয়।

* * * *

অল্পপরিসর ময়দানটুকুতে আর তিল ধারণের স্থান নাই। মুক্ত মাসানের অভ্যর্থনায় হাজার হাজার মজুর জমায়েৎ হইয়াছে। এক একজন নেতা মাসানের উপর কারখানার কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের কাহিনী ও মজুরদের প্রতি তাহাদের ঘৃণ্য ব্যবহারের উদাহরণ শ্রোতাদের নিকট বর্ণনা করেন।

দূর হইতে শুধু দেখা যায় কাল কাল অগণিত মাথা আর শুধু লাল ঝাণ্ডা বাতাসে পত্ পত্ করিয়া উড়ে আর দেখা যায় তাহাদের মধ্যে শ্রমিকদের নেতা বক্তৃতা করিতেছেন।

সভার কার্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। হরেন দত্ত সমবেত মজুরদের সম্বোধন করিয়া বলিতে ছিলেন:

কম্‌রেডগণ, আমার পূর্ববর্তী বক্তাগণ কমরেড মাসানের উপর কলকর্তৃপক্ষ যে কি অন্যায় অত্যাচার করিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন। আরও ছয়জন কম্‌রেড মাসানের মতন নির্যাতন ভোগ করিয়া সম্প্রতি মুক্ত হইয়াছেন। মজুরদের আদর্শের জন্য তাঁহারা যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তার পুরস্কার আজিকার শোভাযাত্রায় আর এই সভায় শত শত মজুরের অভ্যর্থনা। এই অভ্যর্থনায় আজ মজুররা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, কলের কর্তৃপক্ষ যাহাদের বিনা দোষে নির্যাতন করিয়াছে মজুর তাহাদের আপনার অন্তরংগ করিয়া লইয়াছে। নিস্ব মজুরদের এই পরিচয় হয়ত পুঁজিবাদীদের কাছে যথেষ্ট !

হরেন দত্ত আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তিনি আর কিছু বলিবার অবসর পাইলেন না। নেতাদের বক্তৃতার প্রতি একান্ত ভাবে আকৃষ্ট সমবেত শ্রোতাদের আশ্চর্য করিয়া তুইখানি লরীতে একদল সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া হাজির হইল।

পুলিশের কর্তা ১৪৪ ধারার একখানা নোটিশ বক্তার সম্মুখে হাজির করিয়া অনতিবিলম্বে সভা ভংগ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পালন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তৎক্ষণাৎ পুলিশ হরেন দত্ত ও বক্তৃতামঞ্চের নিকট উপবিষ্ট হরলাল, অজিত দত্ত প্রমুখ কয়েকজনকে গ্রেফতার করিল। কমরেড সান্যাল বক্তৃতামঞ্চের নিকট গিয়া এইরূপ আদেশ বে-আইনী বলিয়া শ্রোতাদের ছত্রভংগ হইতে নিষেধ করিলেন। তিনিও

পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলেন। অতঃপর পুলিশ জনতার ভিতর প্রবেশ করিয়া লাঠিচালনা করিয়া সকলকে ছত্রভংগ করিয়া দিল। মজুররা এইভাবে বিতাড়িত হইয়া যে যাহার আস্তানার দিকে চলিয়া যায়। বিহারী আবদুল বারি ও ভৌমিককে লইয়া সনতের অন্বেষণে চলে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে শহরের রাস্তায় রাস্তায় একজন লোক ঢোল বাজাইয়া সহরৎ করিয়া বেড়ায়ঃ পুলিশ-সাহেবের হুকুমে সহরে ১৪৪ ধারা জারী হ'য়েছে। সন্ধ্যা ৬টার পরে কেউ রাস্তায় হুকুম ছাড়া বার হ'তে পারবে না অথবা দিনের যে-কোন সময় একত্রে পাঁচজন হল্লা কিংবা সভা করতে পারবে না। সরকারের হুকুম।

উনিশ

হাসপাতালের নির্জন কক্ষে অজয় বাবুর এতগুলি ঘণ্টা কাটিয়া যায়। লক্ষ্মীবতী স্ত্রী তাঁহার নিজের প্রাণ দিয়া স্বামীর প্রাণ রক্ষা করিয়া গেল ইহা হিন্দুর পবিত্র সংসারে হয়ত উপভোগ্য কিন্তু অজয়বাবু চারিদিক খুঁজিয়াও কোথাও কোনদিক থেকে ইহাতে সান্ত্বনার কিছু পায় না। নিজের আঘাত প্রায় নিরাময় হইয়াছে…শারীরিক দুর্বলতা শুধু আছে সত্য কিন্তু তার অধিকটুকুর কারণ মনের দ্বন্দ্ব যা সহসা শেষ হইতে চায়না।……

সনৎ আসিয়াছিল, শুধু মাত্র অল্পক্ষণের জন্য ; কিন্তু যে ক্ষণটুকু সে ছিল, মনের শান্তি সে পাইয়াছিল যা-কিছু। স্ত্রীর এ-আত্মদানের মূল্য যে সনৎ তাঁহার কাছে খোলসা স্বীকার করিতে চায়নি,—এ আত্মদান যে বুদ্ধিহীন অথবা নিছক সেজন্য নয়…সনতের চোখ আজ চারিদিককার দুনিয়া সেভাবে দেখে না তাই। সেজন্যই হয়ত অজয়বাবু যখন সনৎকে প্রশ্ন করে : সীতার সতীত্বের জুড়ি কি এই আত্মদান নয়, সনৎ ?—সনতের মুখ হইতে শুধু বাহির হয় : আমাকে অত ভাব্‌তে ব'লনা, অজয় !

তারপর সনৎ চলিয়া যায়। অজয়বাবু হাসপাতালের শয্যায় শুইয়া শুইয়া সারারাত্রি ভাবিয়াছেন, সনৎ আর তাঁহার মধ্যে হয়ত কোন ব্যবধান নাই কিন্তু সনৎদের বর্তমান আওতায়

যে সমাজ আর তাঁহাদের যে চিরাচরিত সমাজ এ যেন রেলের তুইটি লাইনের মত চলিয়াছে···কোথাও গিয়া মিশ খায় নাই। স্বাধীন রাজ্যে রাজ্যে ব্যবধানের সীমান্তরেখা আছে··· উপদ্রব নাই আবার উপদ্রবও হয় কিন্তু ইহারা যেন নিজেরাই তুই সমাজের এই সমান্তরাল ব্যবধানের উপর এক ওভারব্রিজ খাড়া করিয়া দেয়···নিজেরাও যাইতে চায়, অপরকেও আসিতে দেয়।

সনৎ যাইবার সময় ইচ্ছা করিয়াই অজয় বাবুর শুশ্রূষার জন্য জঙলীকে রাখিয়া গিয়াছিল। সকাল বেলা অজয়বাবুর ঘুম ভাঙিবার আগেই জঙলী ঘরদোর ঝাড় দিয়া পরিষ্কার করিয়া হিন্দুস্থানী দারোয়ানটাকে ফল তুধ আনিবার জন্য বাজারে পাঠায়। ঘড়ির কাঁটায় তখন ঠিক ছয়টা বাজিয়াছে। প্রথম রাত্রে ঘুমহীন শয্যায় কাটাইয়া শেষ রাত্রের ঘুমটা তাঁহার গভীর হওয়ায় জঙলীর কয়েকটা ডাকেও তাঁহার ঘুম ভাঙে না,—এক দাগ ঔষধ খাওয়ার সময় হওয়ায় অগত্যা সে তাঁহার গায় একটা নাড়া দেয়। আচমকা তন্দ্রা ভাঙিয়া যাওয়ায় তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন : কে!

জঙলী থতমত খাইয়া উত্তর দেয় : আমি!

অজয়বাবু চোখ মেলিয়া চাহিয়া বলেন : ও, জঙলী! দারোয়ানটা গেল কোথায়?

"বাজারে গেল···ফল আর তুধ আনতে পাঠালাম।" জঙলী উত্তর দেয়।

অজয়বাবু বলেন: পাকা গিন্নী দেখ্‌ছি···কিন্তু সংসার তোর একটা হ'ল না, জঙলী!

জঙলী কোন কথা বলে না।

অজয়বাবু আবার বলেন: লজ্জা কি, জঙলী! সেবায় মেয়েলোক চিরকাল পাকা···ও তোদের স্বভাব!

জঙলী তবু নিরবে থাকে।

অজয়বাবু ছোট টেবিলটার উপরকার স্যুট্‌কেশটার দিকে নিজের অঙুলি নির্দেশ করিয়া বলেন: স্যুট্‌কেশটা খোল্, জঙলী, উপরেই একখানা ছবি আছে···নিয়ে আয়।

জঙলী স্যুট্‌কেশের ভিতর হইতে ছবিখানা বাহির করিয়া আনিয়া বলে: কার ছবি?

অজয়বাবু ছবিখানা হাতে লইয়া উত্তর দেন: আমার জেনানার······

"আহা: ইনিই মারা গেছেন···ব্যাটারা পিশাচ" জঙলী বলিয়া উঠে।

অজয়বাবু প্রশ্ন করেন: তোর কাদের উপর সন্দেহ হয়।

জঙলী উত্তর দেয়: মজুর-ফৌজের সকলেই ত' বল্‌ছে··· জমিরের দল! আমারও তাই মনে হয়।

জঙলী ঔষধের শিশি হইতে একদাগ ঔষধ গ্লাসে ঢালিয়া অজয়বাবুর হাতে দিয়া বলে: আপনার ঔষধ খাওয়ার সময় হ'য়েছে।

"ক'টা বাজল" অজয়বাবু প্রশ্ন করেন।

"...সাড়ে ছ'টা..." জঙলী উত্তর দেয়। অজয়বাবু আবার বলেন : তুই ঘড়ি দেখ্‌তে জানিস্‌, জঙলী!

"জান্‌ব না...এতদিন কলে কাজ করলাম..." জঙলী উত্তরে বলে।

এক ঢোকে ঔষধ খানি গিলিয়া ফেলিয়া গ্লাসটি জঙলীর হাতে দিয়া অজয়বাবু বলেন : এ কাণ্ডটার জন্য তোর কষ্ট হয়?

জঙলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দেয়।

"...কার জন্য? আমার জন্য, না আমার জেনানার জন্য ..." অজয়বাবু প্রশ্ন করেন।

জঙলী শুধু আঙুল দিয়া ছবিটার প্রতি নির্দেশ করে।

অজয়বাবুর মুখ খানা একটু মলিন হয়। তবু মুখে একটু হাসি ফোটাইয়া তিনি বলেন : আমার এতবড় লোকসান হ'ল ...সে বুঝি কিছু নয়।

সহসা জঙলী বাহিরের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠে : কিসের গোলমাল হ'চ্ছে...ভয়ানক হৈ-চৈ!

"ও কিছু না..."অজয়বাবু বলেন।

জঙলী ভয়ে ও আশংকায় বিবর্ণ হইয়া উঠে। সে বলে : না...অজয়বাবু...বড় গোলমাল!

অজয়বাবু তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন : হাট বাজার অথবা কলের লোকদের আওয়াজ হয়ত।

"...না...না! সে আওয়াজ এমন নয়" জঙলী বলে।

বাহিরের দিকে খুব মনোযোগের সহিত কান রাখিয়া সে বলিয়া উঠে: গুলি চল্‌ছে···কলের গেটে !

অজয়বাবু উঠিয়া দেখিবার উদ্যোগ করেন। জঙলী তাঁহাকে বলিয়া উঠে: আপনি শুয়ে পড়ুন···আপনার দারোয়ান এখুনি আস্‌বে···আমি যাই।

"তুই কোথায় যাবি আর গিয়েই বা কি ক'রবি ?" অজয়বাবু বলিয়া উঠেন।

জঙলী আপনহারা হইয়া বলিয়া চলে: গুলি চল্‌ছে··· আমি চল্‌লাম অজয়বাবু···কলের গেটে মাসান র'য়েছে··· সনৎ র'য়েছে···রোশেন র'য়েছে !

"শোন্···শোন্···জঙলী" অজয়বাবু চিৎকার করিয়া উঠেন।

সে ডাক জঙলীর কানে গিয়া আর পৌঁছায় না।

কুড়ি

অনেকক্ষণ ধরিয়া জঙলী ছুটিয়া ছুটিয়া চলে। রাস্তা, ঘাট, দোকান, পসার কোন দিকে তাহার কোন খেয়াল নাই। কম্পিত পদক্ষেপে সে ছুটিতে ছুটিতে চলে।

সহসা আবার পর পর দুইটি গুলির আওয়াজ তাহার কানে আসে। বুক তাহার দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে। অশুভ আশংকায় তাহার গলা যেন শুকাইয়া কাঠ হইয়া পড়ে।

চলবার গতি সে আরও খানিক বাড়াইয়া দেয়। দ্রুত চলনে সে হাঁপাইয়া পড়ে তবু সে তেমন ভাবেই ছোটে।...

প্রান্তরের উপর যেখানে বরখাস্ত মজুরের দল আড্ডা গাড়িয়াছিল সেখানে আসিয়া জঙলী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। দুই চক্ষু যতদূর যায় ততদূর সে চাহিয়া দেখিল কোথাও একটি মজুরও নাই। একটা বিপর্য্যয় যে কল-এলাকায় ঘটিয়াছে তা' সে প্রথম গুলীর আওয়াজে বুঝিতে পারিয়াছে কিন্তু সে বিপর্য্যয় কতদূর গড়াইল এতখানি আসিয়াও সে কিছুই অনুধাবন করিতে পারিল না। কতদিনকার মজুরদের ঘরসংসারের আওয়াজে ঝম্ ঝম্ প্রান্তর একেবারে খালি পড়িয়া রহিয়াছে,—একটা মানুষের চিহ্ন পর্য্যন্তও সেখানে নাই।

আশে পাশে কোথাও একটা খবর নেওয়ার অবসরও তাহার নাই। তাড়াতাড়ি কলের গেটে পৌঁছাইবার জন্য সে ছুটিয়া চলে।

এতক্ষণ পরে সে কল-এলাকার খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। গুলির আওয়াজ আর পাওয়া যায় না···কোন সোরগোলের আভাষও সে বুঝিতে পারে না। মনে হয় যেন চারিদিক একেবারে নিরব···নিঝুম!

বড় রাস্তা হইতে নামিয়া এক্‌টা দৌড়ে সে প্রায় কলের সাম্‌নে আসিয়া হাজির হইল কিন্তু অগ্রসর হইবার সাহস তাহার হইল না। যাহাদের সে কারখানার সাম্‌নে দেখিতে পাইবে আশা করিয়া এতটা রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কাহাকেও সে ত এখানে দেখিতে পায় না। সে সনৎ, বাবুলাল, হরলাল, বিহারী, রহমন কেহ ত সেখানে নাই। সারা কারখানার সম্মুখ আগ্‌লাইয়া শুধু খাড়া রহিয়াছে সশস্ত্র পুলিশের দল। জঙলী পিছু হাটিতে সুরু করে।

কোথায় গেল তারা? জঙলী মহা ভাবনায় পড়ে। প্রান্তরের বরখাস্ত মজুরের দল নাই, এখানে সনৎ, হরলাল নাই, তবে কি তাহারা এ কারখানার মায়া চির জনমের মত ছাড়িয়া দূরে—বহুদূরে চলিয়া গেল! সেও ত তাহাদেরই একজন। তাহাকে কেন তাহারা সংগী করিল না? কি তাহার অপরাধ?

সনৎ, হরলাল তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল···জমির বিলাত তাহাকে গ্রহণ করিতে ভয় পায়···সে এখন কোথায় দাঁড়ায়। পৃথিবীর এ বিরাট চন্দ্রাতপ তলে তাহার যে রুটি নাই, মাটি নাই, সহায় নাই।

রোশেনালী! জঙলীর রোশেনালীর কথা মনে হয়। একবার তাহার খোঁজটা লওয়াই যেন সে যুক্তিযুক্ত মনে করে। এতক্ষণ স্‌টেশনে হয়ত সে মোট বহিতেছে, তাহার কাছে যাইতে জঙলীর মনে সরে না। সারাটি দিন মোট বহিয়া সে খুব বেশী চারি আনা পয়সা হয়ত রোজগার করে। একটা পয়সা হাত পাতিয়া চাহিলে রোশেন হয়ত দেয় কিন্তু তাহার নিজের হাতখানাও জঙলীর হাতে পয়সাটা দিবার সময় কাঁপিয়া উঠে। পিছন ফিরিয়া সে তাহার গাঁটির পয়সাটা আবার হিসাব করে। তারপর মনে মনে বিড় বিড় বকিয়া দেখে দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থান তাহাতে রহিল কিনা। জঙলী যতই এ জিনিষটা ভাবে স্‌টেশনের পথে ততই তাহার পা সরিতে চায় না।

আনমনা ভাবনায় জঙলী স্থান কাল ভুলিয়া গিয়াছিল। একটা সেপাই তাহার ভাবসাব দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিল: এই ক্যা মাঙতা।

জঙলী উত্তর দেয়ঃ কিছু না।

"ভাগ জল্‌দি" সিপাইটি বলিয়া উঠে।

জঙলী প্রশ্ন করেঃ কেন?

সিপাই উত্তর দেয়ঃ বহুৎ হাল্লা···ভাগ যা···

জঙলীর চোখ মুখ কাল বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আর বেশী কিছু শোনবার ভরসা হয়না। অবসাদের তাজা বিষ যেন তাহার সমস্ত দেহের শিরায় শিরায় সংক্রামিত হইয়াছে।

সিপাহীর যাহা কিছু বলিবার একদমে বলিয়া ফেলিলেই সে যেন বাঁচিয়া যায়।

সিপাইটি জঙলীর দেরী দেখিয়া একটা ধমক্ দিয়া উঠে। সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া হন্ হন্ করিয়া ছোটে। কলের বাজার একদম্ ফাঁকা···লোকজনের যাতায়াত নাই। দোকান পাট সব বন্ধ। অপরূপ নিস্তব্ধতা, জঙলী আর কোনদিন এ প্রত্যক্ষ করে নি।

সহসা পিছনে সে রিক্সা গাড়ীর ঠন্ ঠন্ আওয়াজ পায়। একটা রিক্সাওয়ালা রিক্সা টানিতে টানিতে আসে।

জঙলী ছুটিয়া একেবারে রিক্সাওয়ালার কাছে গিয়া প্রশ্ন করে: চারিদিক সব দোকান পাট কেন বন্ধ বল্‌তে পার?

রিক্সাওয়ালা উত্তর দেয়: সকাল বেলায় কারখানার গেটে গুলি চ'লেছে। চার আদমী একেবারে তখনই ম'রেছে ···দশ বার জন জখম হ'য়ে হাসপাতালে পড়ে আছে আর বহু লোককে পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেছে। আতংকে কেহ আর ঘরের বার হয় না।

বজ্রাহতের মত জঙলী সেখানে দাঁড়াইয়াই থাকে। কখন যে জনমানবহীন পথে একটা মাত্র সংগী রিক্সাওয়ালাটাও বিদায় লইয়াছে তাহার খেয়ালই নাই।

জঙলী চলিতে চলিতে অগ্রসর হয়। তাহার নিজেরই অজ্ঞাতসারে যেন তাহার পা দু'খানি হাসপাতালের দিকে তাহাকে টানিয়া নিয়া চলে। আপনার মনে সে আপনিই

হিসাব করে কে কে চারিজন মরিয়া গেল...সনৎ, হরলাল, বিহারী, বাবুলাল, ওয়াহেদ, রহমান, মাসান্, রোশেন... ইহাদের কে কে মরিল...কে কে বাঁচিল। সরু লাল রাস্তার দুধারে ঝাউ গাছের শন্ শন্ শব্দ বাতাসে ভাসে। বাতাসে যেন কে বলিয়া উঠে তাহার কাণে কাণে সনৎ মরিয়াছে... আবার একটা দুম্‌কা হাওয়া আসে, সে যেন বলিয়া উঠে রোশেন মরিয়াছে...এম্‌নি হাওয়ার পর এক্‌টা হাওয়া আসে আর যেন বলিয়া যায়,—রোশেন, মাসান, রহমান, হরলাল সবাই মরিয়াছে কেও আর এ দুনিয়ায় নাই! জঙলী বার বার তাহার মনকে প্রশ্ন করে: সত্যিই কি তারা এ দুনিয়ায় নাই!

হাসপাতালের ভিতরে আর তাহার যাইতে হইল না। বাহিরে একখানা লরী দাঁড়াইয়া আছে আর কয়েকজন অপরিচিত লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া অজয়বাবু কথা বলেন। জঙলীকে দেখিতে পাইয়া করুণ আবেগভরে অজয়বাবু বলিয়া উঠেন: জঙলী, এতক্ষণে এলি...একটু আগে যদি আস্‌তিস!

"এ সব কি, অজয়বাবু।" জঙলী প্রশ্ন করে।

অজয়বাবু উত্তরে বলেন: আর কি? সনৎ আমাদের ফেলে চ'লে যাচ্ছে। ঘণ্টা খানেক আগে এলেও দেখা হ'ত, জঙলী! কথা বল্‌ছিল। গুলীটা একেবারে কাঁধের কাছে লেগেছিল···রক্ত কিছুতেই বন্ধ হ'ল না।

বিবর্ণ জঙলী হাঁ করিয়া অজয়বাবুর মুখের পানে চাহিয়া থাকে শুধুই······

হিন্দু সৎকার সমিতির লোকেরা শবদেহ হাঁসপাতালের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনে। জঙলী আর নিজেকে আত্মস্থ রাখিতে পারে না। উন্মাদিনীর মত চীৎকার করিতে করিতে সে শবদেহের উপর গিয়া পড়ে।

স্বেচ্ছাসেবকগণ জঙলীকে শবদেহ হইতে ছাড়াইয়া অজয়বাবুর কাছে আনিয়া বলে: একটু দেখুন,···ততক্ষণ আমরা কাজটা সেরে নিই। আত্মীয় কুটুম কেও নাকি ?

অজয়বাবু বলেন: না, না···আত্মীয় কুটুম কিছু নয়। এক কলে কাজ করত। কম্‌রেড।

স্বেচ্ছাসেবকগণ মৃদু হাসে।

জঙলী অজয়বাবুকে প্রশ্ন করে: কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা।

"আর কোথায়······শ্মশানে" অজয়বাবু উত্তর দেন। একটু বসিয়া অজয়বাবু আবার বলেন: দুঃখ করিস্‌না, জঙলী। অনেকের শেষ শয্যায় ব'সবার সৌভাগ্যই বল আর দুর্ভাগ্যই বল আমার হ'য়েছে কিন্তু এমন মৃত্যু আর দেখিনি। হাঁসপাতালে যখন তাকে নিয়ে এলো কাঁধে তখন তার গুলী বিঁধে···ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত পড়ছে কিন্তু মুখে তার হাসি। যন্ত্রণার এতটুকু চিহ্ন তার মুখে চোখে দেখিনি। আমি কাছে এসে প্রশ্ন করলাম: খুব কষ্ট হ'চ্ছে, সনৎ। সনৎ হাসিমুখে বল্ল: কষ্ট ত আমাদের পাওনা, অজয়। এই সব কষ্টের ছোঁয়াচই ত মজদুরদের ভাগ্যের ভিৎ গাঁথবে..."

সনতের শবদেহ লইয়া সৎকারসমিতির লরীখানা রওনা দিল।

অজয়বাবুর বক্তব্য শেষ করিবার অবসর না দিয়াই জঙলী ভাংগা গলায় বলিয়া উঠে : ওরা কোথায় ? ওরা ?

অজয়বাবু বলেন : ওরা কারা ? মাসান ! মাসানদের পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

"সবাইকে...সবাইকেই পুলিশ ধ'রে নিয়ে গেছে...হরলাল, বাবুলাল, বিহারী..."জঙলী জড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

অজয়বাবু উত্তর দেন : হরলাল, বিহারী ত আগেই ধরা প'ড়েছে......

হ্যাঁ :...হ্যাঁ :...হ্যাঁ :, ওরা ত' আগেই ধরা. প'ড়েছে। আমার ভুল হ'য়ে যাচ্ছে, অজয়বাবু ! রহমানও ত ঐ সাথে গেছে আচ্ছা, বাবুলাল, ফজল, মুরারী...।"

"একটু অপেক্ষা কর, জঙলী ! ডাক্তার জানে কলের গেটে গুলি খেয়ে যে ক'জন লোক ম'রছে তাদের নাম। আমি জেনে আসি।" অজয়বাবু এই বলিয়া হাসপাতালের ভিতর চলিয়া গেলেন।

ফিরিয়া যখন আসিলেন জঙলীকে আর তিনি দেখিতে পাইলেন না। চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না।

জঙলী গিয়াছে স্টেশন যেখানে রোশেন রোজ মোট বয়। আজ মোটও আসে...কুলিরও হাঁকডাক হয় কিন্তু রোশেন ত আসে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে যে যাহার রোজগারের পয়সা গুনিতে গুনিতে ঘরে ফিরে, তাহাদের

দলেও রোশেনকে দেখা যায় না। রেল লাইনের ধারটা ধরিয়া খানিকটা ঘুরিয়া আসে কিন্তু কই রোশেন কি এদিকটাও আসে না। ওভারব্রিজের উপর গিয়া উঠে... রোশেন হয়ত এদিকে আসিবে। শহরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাহারও দেখা না পাইয়া নিশ্চয়ই সে এখানে আসিবে কিন্তু এক প্রহর রাত্রি চলিয়া গেল...আকাশভরা তারা উঠিল, রোশেন আসিল না!

আকাশের তারা গুনিয়া রেলের আলো দেখিয়া আর ওভারব্রিজের উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ রাত্রের দিকে সবেমাত্র তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সহসা ভোরের আপ্ গাড়িখানার শব্দে তাহার স্বপ্নের ঘোরে মনে হইল তাহার কত আপনার সব লোকেরা কোথায় যেন গিয়াছিল,...... জয়োল্লাসে তাহারাই যেন এখন ফিরিয়া আসে। ধচ্‌মচ্ করিয়া উঠিয়া সে সিঁড়ি ভাংগিয়া নামিতে থাকে, উপবাসী তন্দ্রালস দেহ সহসা টলিয়া উঠে!......

ভোরের আলোয় স্টেশনের লোকেরা দেখিল ওভার-ব্রিজের সিঁড়ির তলায় একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া রহিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া তাহারা দেখিল প্রাণবায়ু তাহার নাই। বুভুক্ষিতার শেষ দীর্ঘশ্বাস ততক্ষণ আকাশে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে।

সমাপ্ত

